মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম.এ প্রথম সেমেস্টার

বিষয় : বাংলা

পত্র – AECC (105)

পূর্ণমান : ২৫

গ্রন্থ সমালোচনা

– অধ্যাপক ড. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য সৃষ্টিতে যেমন প্রতিভার প্রয়োজন হয় তেমনি সাহিত্য সমালোচনা বা গ্রন্থ পর্যালোচনাও সোজা কাজ নয়, তাতেও প্রতিভার প্রয়োজন হয়, অনুশীলনের প্রয়োজন হয়– প্রয়োজন হয় যথার্থ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছেন। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সমালোচকের করণীয় কি তা বলতে গিয়ে লিখেছেন– "সাহিত্য বিচার করার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি, দ্বিতীয় তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।" গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রেও একথা খাটে। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এটিই একমাত্র মাপকাঠি একথা ভাবলে ভুল করা হবে। এর অনেকগুলি মাপকাঠি আছে যার মধ্যে এটি একটি। যেমন রচানাশক্তির নিপুণতা কিভাবে প্রকাশ পাবে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে নিজের মনের ভাবকে অন্যের কাছে অর্থাৎ পাঠকের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য ভাবটিকে তার কাছে বড়ো করে তুলতে হয়। 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,– "সত্যরক্ষাপূর্বক এই বড়ো করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।" উক্ত প্রবন্ধটির নামেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ এখানে সাহিত্যের বিচার করবেন যাঁরা তাঁদের প্রসঙ্গে নানা কথা বলেছেন। তাঁর মতে সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে কারোর কারোর সাহিত্য বিচার করার অসামান্য শক্তি থাকে। তাঁরা যেমন চিনে নেন যা কিছু ধ্রুব, চিরন্তন তাকে তেমনি ক্ষণিক সংকীর্ণ যা তা তাঁদেরকে ফাঁকি দিতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,– "স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁরা সর্বকালীন বিচারকের পদগ্রহণ করিবার যোগ্য।"

স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন এইরূপ সমালোচকেরা সাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু সব সমালোচকই এই শ্রেণিতে পড়েন এমনটা নয়। কিছু সমালোচক রয়েছেন যাঁদের বিদ্যা পুথিগত। "যাঁরা দেউড়িতে বসিয়া হাকডাক তর্জন গর্জন ঘুষ ও ঘুসির কারবার করিয়া থাকে, অন্তরপুরের সহিত" যাঁদের পরিচয় নেই তাঁদের তিনি সমালোচনার অনুপযুক্ত বলে মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে 'এঁরা ব্যবসাদার বিচারক'। বলাবাহুল্য গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের 'ব্যবসাদার বিচারক' নয়, উক্ত প্রথম শ্রেণীর বিচারকের পদাঙ্কই অনুসরণ করা উচিত।

এবার আমি মূল বিষয় অর্থাৎ গ্রন্থ সমালোচনা কিভাবে করা যেতে পারে তা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবো। যেকোনো গ্রন্থ সমালোচনার আগে মনে রাখতে হবে শুধু সেই গ্রন্থটি বা সেই গ্রন্থের গ্রন্থকার সম্বন্ধে দু একটি কথা আকস্মিকভাবে লিখে দিলেই কিন্তু যথার্থ সমালোচনা হবে না। গ্রন্থটি সাহিত্যের যে বিভাগে পড়ে সে সম্বন্ধে যেমন গভীর জ্ঞান প্রয়োজন তেমনি গ্রন্থকার সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে জানা চাই। ধরা যাক কবি আল মাহমুদের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক গ্রন্থটি আমরা সমালোচনা করব। প্রথমেই লিখতে হবে–

শ্রেষ্ঠ কবিতা (অর্থাৎ গ্রন্থের নাম)

আল মাহমুদ (গ্রন্থকারের নাম)

প্রতিভাস। কল-২ (প্রকাশকের নাম, ঠিকানা)

২০০.০০ (গ্রন্থের মূল্য)

এরপর পর্যালোচনাটির একটি শিরোনাম দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমি নাম দিলাম,– 'স্মৃতির ভেতরে ফণা তোলে আশ্চর্য ভালবাসা।'

এরপর ধীরে ধীরে প্রবেশ করব গ্রন্থের ভেতরে। প্রথমেই কবি সম্বন্ধে দু-এক কথা বলে নিতে হবে। যেমন বলা যেতে পারে, –কবি আল মাহমুদের কবিসত্তার আলো-ব্যথা-অভিমান সবই প্রেম। তাঁর সে প্রেমের অভিযাত্রা চলে যায় জীবনের গভীর থেকে গভীরে। সেখান থেকে সে সঞ্চয় করে আনে বেঁচে থাকার আশ্বাস। আল মাহমুদের অবস্থান আন্তর্জাতিক মানচিত্রে হলেও তিনি কখনো ভোলেননি নিজের শিকড়। সেই শিকড়ের সন্ধানে তিনি বারবার ফিরে আসেন মা'র কাছে, মাতৃভূমির কাছে। স্বভূমির ঐতিহ্য-প্রকৃতি-মানুষের রসায়নই তাঁর সৃজন শক্তি।

এই সময়ের অন্যতম এই প্রধান কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘লোক লোকান্তর’। সেই সময়ে সেই তরুণ কবি তখন কখনো উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরছেন জীবনের অলি-গলি, কখনো তীব্র পিপাসায় কাম জমাট বাঁধছে কলমের মুখে, কখনো শেষ বিকেলের বিষন্নতায় ডুবে যাচ্ছেন আবার কখনো নিজের হাতে নিজেই ভেঙ্গে দিচ্ছেন স্বপ্নের ঘর দোর। নিভৃত হৃদয়ের কান্না হয়ে যা ঝরে তা আসলে ‘বিধাতার অশ্রু, – ‘স্বর্গীয় কান্না সেই মরে যায়, পার্থিব হাওয়ায়/ মানুষের ধর্মে কর্মে, অন্ধকারে, আলোয়, মাটিতে।’ বাংলার প্রকৃতি এই কবিকে দেয় অদ্ভুত শান্তি, আস্তিকতার বোধ, তাইতো কোন অবস্থাতেই ভরসা হারাননা কবি।

শরীরে মাটির গন্ধ আর মনে ভাষা সাধকের অঙ্গীকার নিয়ে কবির কলমে মূর্ত হয়ে ওঠে ‘কালের কলস’ অযূত তৃষ্ণা নিয়ে কালের পথ ধরে যেতে যেতে তাঁর সাথে দেখা হয় রঙ্গ নাম্নী বৈষ্ণবীটির সাথে। এর সাথেই তো তাঁর প্রাণের খেলা। সে কখনো সবুজ গ্রামের কন্যাটি যে নদীর জলে কলস ডুবিয়ে দেয়, তখন তার ‘কাজল ভিজিয়ে নামে কালিময় নয়নের নদী’, কখনো সে এক বাপের কবরে গিয়ে মোম জ্বেলে ক্রন্দনরতা দুখিনী জননী। কখনো আবার গ্রামের ছোট ছেলেটি আঠালো লতায় জোনাকপোকা বেঁধে মালা গেঁথে সাজিয়ে দিচ্ছে তার মাকে। বাংলার এই নিজস্ব প্রকৃতিই কবির আশ্রয়ভূমি। সেখানে দলকলসের ঝোপে কবি কাফন পরে কাত হয়ে শুয়ে মৃত্যুকে কল্পনা করেন, – ‘আকাশে উবুড় হয়ে ভেসে যেতে থাকে এক আলোর কলস।’

আল মাহমুদের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘সোনালি কাবিন’। এখানে প্রকৃতি তীব্র কামগন্ধময়– যেন শঙ্খনাগ। এখানে শরীরে গাঁথা আছে ইতিহাস, প্রাকৃতিক নির্যাসে ছুঁয়ে যায় যৌনতা। ‘প্রকৃতি’ কবিতায় উচ্চারণ করলেন,– ‘ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে/ কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে/ ভাবলাম, এ মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষানি আমার।’ তীব্রবেগে বয়ে চলা নদীর জলধ্বনিকে সাক্ষী রেখে উড়ে যান তিনি আর বনহংসিনী। প্রিয়তমা মৃত্তিকাকে তীব্র আশ্লেষে বলেন– “চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ/ উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়।” এই মাটিতেই তো মিশে আছে মুকুন্দরামের রক্ত, শবর-শবরী, বেহুলার শরীর। বাংলার প্রকৃতি অপূর্ব ঐশ্বর্যে এখানে প্রাণবন্তী।

এভাবেই এগিয়েছে কবি আল মাহমুদের কাব্যচর্চা। বাংলাদেশের প্রবল সংকটময় সময়ে তাঁর কলমও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে, কবিতা হয়ে উঠেছে যুদ্ধের সৈনিক। ‘মায়াবী পর্দা দুলে ওঠে’ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর উচ্চারণ– ‘সাবধান, আমার মাঝে কেউ যেন গোলামের

গর্ভধারিণী না বলে।' 'জেলগেটে দেখা' কবিতায় মর্মান্তিক ভাষায় লেখেন,– "আমি ফররুখের কবর পেছনে রেখে/ একটা কালো শেয়ালকে তাড়াতে তাড়াতে/ বাংলাদেশের মানচিত্রের উপর দিয়ে/ আমার কাফন নিয়ে দৌড়োতে লাগলাম।'

এভাবেই 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না' গ্রন্থে দেখব নারী, প্রকৃতি, আল্লাহ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কাব্যগ্রন্থে ভালোবাসা, ধর্মবোধ ছড়ায় স্নিগ্ধ নরম আলো, – "আমার রোদনে জেনো জন্ম নেয়, সর্বলোকে ক্ষমা/ আরশে ছড়িয়ে পড়ে আলো হয়ে আল্লাহর রহম্/ পৃথিবীতে বৃষ্টি নামে, শষ্পে ফুল, জানো কি পরমা/ আমার কবিতা শুধু অই দুটি চোখের কসম।" একে একে প্রকাশিত হতে থাকে 'আরব্যরজনীর রাজহাঁস', 'প্রহরান্তের পাশফেরা', 'এক চক্ষু হরিণ', 'মিথ্যাবাদী রাখাল', 'আমি দূরগামী', 'দোয়েল ও দয়িতা', 'দ্বিতীয় ভাষণ', 'নদীর ভিতরে নদী', 'উড়ালকাব্য', 'বিরামপুরের যাত্রী', 'না কোনো শূন্যতা মানি না', 'বারুদগন্ধী মানুষের দেশ' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থ জুড়ে কবির যে পরিভ্রমণ চলে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সেইসব মণিমাণিক্য থেকে কয়েকটি করে নির্বাচিত করে ধারণ করে আছে। এ এমন এক কবির মানস চিত্র যিনি শেষ পর্যন্ত ফিরতে চেয়েছেন মাটির কাছে,– 'সোনার পাত্রখানি ভেঙ্গে যায়, ভেঙ্গে যায় রুপোর পাত্রও/ মাটির সানকি ওগো তুমি ধরো পৃথিবীর কবিদের সব অন্নজল।'

কবি আল মাহমুদের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' অত্যন্ত সুখপাঠ্য এবং সুসংকলিত। প্রচ্ছদটি চমৎকার এবং ছাপা ঝকঝকে।

এভাবেই করা যেতে পারে গ্রন্থ পর্যালোচনা। আমরা একটি উদহারণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

ভ্রমণকাহিনী

সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী
বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা গদ্যসাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী রচনা একটি বিশেষ ধারা, আত্মকথনমূলক এই বিবরণ ভ্রমণ : বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ শিল্পরূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর একদিকে কোনো অচেনা অথবা চিরচেনা স্থানের বিবরণ তার বিশেষ আকর্ষণীয় বর্ণনা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, এর অসামান্য প্রকাশভঙ্গী এইসব মিলে ভ্রমণকাহিনী বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য ধারা হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট গদ্য লেখকের লেখনীতে ভ্রমণ সাহিত্য সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট গদ্যশিল্প। এই ধরনের রচনায় কাল্পনিক কাহিনী থাকেনা, কিন্তু কোনো একটি বা একাধিক স্থান তার সম্পর্কে গড়ে ওঠা লোককাহিনী, স্থানমাহাত্ম্য ও যাত্রাপথের বিবরণ এবং একে ভিত্তি করে কখনো কোনো কাল্পনিক কাহিনী প্রভৃতি নিয়ে ভ্রমণকাহিনী বাংলা গদ্য সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ধারা।

প্রথমে উনিশ শতকের বাঙালীর হাতে তীর্থভ্রমণের সূত্রে ভ্রমণকাহিনীর আত্মকাহিনীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। নগেন্দ্রনাথ বসু তীর্থভ্রমণ নামে ১৩২২ বঙ্গাব্দে যদুনাথ সর্বাধিকারীর ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করেন। কবি ও সংবাদপত্র সম্পাদক তাঁর পত্রিকায় 'ভ্রমণকারী বন্ধু হইতে প্রাপ্ত' এই শিরোনামে তৎকালীন দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই ভ্রমণকাহিনী একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিসীমা, কৃষিপণ্যের জমি, সরকারি প্রশাসকের কাছে কোনো জায়গার অবস্থা জনসংখ্যা, নদ-নদী, ভূপ্রকৃতির বিবরণ প্রভৃতি।

ভ্রমণ সাহিত্যের একটা জনপ্রিয় ধারা হয়ে ওঠে ভ্রমণকাহিনী। ভ্রমণকাহিনী মূলত ভ্রমণকারী লেখকের অভিজ্ঞতার কাহিনী, চোখে দেখা ভূপরিক্রমার বিবরণ।

ব্যক্তিগত ভ্রমণকাহিনীই পাঠকের চিত্তে কল্পনাও বাস্তবের সংমিশ্রণে এক অসামান্য মেলবন্ধন হয়ে ওঠে। এই দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ভ্রমণকাহিনী 'পালামৌ' (১৮৮০) লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই রচনাই প্রথম আখ্যানবর্জিত ভ্রমণকাহিনী যেখানে মনোরম সাহিত্যরচনা সম্ভব প্রমাণ করে দেখালেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ছোটনাগপুরের

আদিম অরণ্য পর্বত ছোট ছোট নদী ঝরণা সবই লেখকের রচনায় রসসিক্ত এবং মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে এবং উনিশ শতকে বাঙালি লেখকেরা ভ্রমণকাহিনী লিখতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোম্বাই চিত্র বা আমার বাল্যকাল ও আমার বোম্বাই প্রবাস মূলত আত্মজীবনীর ধারায় লেখা। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রথম চলিতগদ্যে রচিত ভ্রমণকাহিনী, পাশ্চাত্য ও ভারতের সমাজজীবনের তুলনামূলক আলোচনা কৌতুক রসসিক্ত হয়ে পরিবেশিত হয়েছে এখানে।

১৯০২ সালে বিবেকানন্দ ইউরোপ যাত্রীর পত্র লিখেছিলেন, বিদেশযাত্রার বর্ণনা সম্বলিত এই পত্রাবলী 'পরিব্রাজক' নামে প্রকাশিত হয়।

ভ্রমণকাহিনী মূলত ভ্রমণকারী লেখকের সাবজেকটিভ অভিজ্ঞতার কাহিনী। এখানে লেখক আড়ালে থাকেন। ভ্রমণকাহিনীর উদ্দেশ্য হল প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা, ভ্রমণের বিচিত্র বর্ণনা, পর্যটক পর্যটন স্থান সেখানকার মানুষ, সংস্কৃতি তাদের জীবন খাদ্যাভ্যাস থেকে পর্যটন স্থানের বিচিত্র প্রাচীন পরিচয় স্বরূপ সন্ধানের বিস্তারিত বিবরণ থাকে। এই বিবরণ পাঠককে আকর্ষণ করে এবং দ্রষ্টব্য স্থানে নিয়ে যায়, অজানাকে জানার, না দেখাকে দেখার জন্যই এই আকর্ষণ।

স্বাদের এবং পরিবেশন নৈপুণ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে ভ্রমণসাহিত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় –

১. ব্যক্তিগত মননশীল ভ্রমণকাহিনী – উদাহরণ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. নৈর্ব্যক্তিক ভ্রমণ নির্দেশিকা – উদাহরণ ভ্রমণসঙ্গী।

আঙ্গিকের দিক থেকে ভ্রমণকাহিনী পরিবেশনের কয়েকটি বৈচিত্র্য চোখে পড়ে –

১. চিঠিপত্রের আঙ্গিক – য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কুশী প্রাঙ্গনের চিঠি, রাশিয়ার চিঠি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩. ডায়েরী বা রোজনামচার আঙ্গিক –জাপান যাত্রীর ডায়েরী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), পরিব্রাজকের ডায়েরী (বিবেকানন্দ)

৪. সরাসরি বর্ণনা – যুরাল পর্বতের পাদদেশে- অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

৫. চরিত্রপ্রধান ও মননশীল রচনা আঙ্গিক- দেবতাত্মা হিমালয় প্রবোধকুমার সান্যাল, হিমালয়ের পথে পথে – উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা- শঙ্কু মহারাজ। অমৃত কুম্ভের সন্ধানে- সমরেশ বসু (কালকূট)।

বাংলা ভাষায় ভ্রমণসাহিত্য বা ভ্রমণকাহিনীগুলি পাঠকের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। তাই ভ্রমণসাহিত্য বা ভ্রমণ বিবরণ রচনা এখন বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ প্রশস্ত ক্ষেত্র যেখানে সাধারণ পাঠকেরা তা পাঠ করে উৎসাহিত হন। ভ্রমণকাহিনী বা ভ্রমণসাহিত্যকে কিভাবে মূল্যায়ণ করা যায়—

১) ভ্রমণ বিবরণ বা পর্যটন নির্দেশিকা বাঙালীকে পাঠককে ভ্রমণে উৎসাহিত করে তুলেছে কীভাবে।

২) ভ্রমণের বিষয় অর্থাৎ পর্যটন স্থান গুলিকে সাধারণ পাঠকের কাছে তার পুরাকালিক পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় পরিস্ফুট করে তোলা।

৩) দেশ দেশান্তর ভ্রমণের ভিতর দিয়ে সকল পর্যটনকারীদের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য সাধনের প্রয়াস প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪) ভ্রমণ সাহিত্য রচনা ব্যক্তি সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে একটা উওরণের পথে নিয়ে যায় , ক্ষুদ্রতার থেকে বৃহত্তর সত্তায় মানুষের উওরণের পথে দিশা দেখানোর ক্ষেত্রে এই রচনাশৈলীর বিশেষ গুরত্ব আছে।

৫) ভ্রমণকাহিনীর লেখক পরম নির্লিপ্ততার সঙ্গে বিভিন্ন বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের বিবরণ দেন । দেশের ভৌগলিক পরিচয় পাহাড় নদ-নদী উৎসব, মেলা, লোকউৎসব, লোক শিল্প প্রভৃতি লেখকের দৃষ্টিকোণে রচনার গুণে সকলের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। রস পরিবেশনের দিক দিয়েও খেয়াল রাখতে হয় ভ্রমণকাহিনী যাতে সরস ও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে, লঘু কৌতুক রস, হাস্য পরিহাস, নতুন স্থানের প্রতি আকর্ষণ কৌতুহল এসব সুপ্রযুক্ত হলে ভ্রমণ কাহিনী সরস হয়ে ওঠে।

৬) সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসচর্চা ও ভ্রমণসাহিত্যে সমান গুরুত্ব পায়। ভারতের ইতিহাসে মেগাস্থিনিসের প্রথম ভ্রমণকাহিনী 'ইণ্ডিকা' বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । এটি চন্দ্রগুপ্তের মৌর্যের সময় (৩২১-২৯৭ খৃঃ) রচিত। তাঁর সময়কালের ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের ইতিহাস এক অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

মেগাস্থিনিসের পর ভারত সন্ধানে যে পর্যটক আসেন তিনি হলেন চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (৪০০-৪১০)খৃঃ বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষা নেন, ভারতবর্ষে বিস্তৃত পরিসরে মধ্যভারত পাটলিপুত্র কান্যকুব্জ, সাঁচী, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, লুম্বনী, বৈশালী, তিনি পথিকের মত ঘুরেছেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে প্রতীয়মান হয়েছে ভারতের আর্থ -সামাজিক অবস্থা, রাজ্যশাসন, ধর্মসাধনা, শিল্প, স্থাপত্য, নগর পরিকল্পনা। এইভাবে প্রাচীন ভারতের আন্তর্দেশীয় সম্পর্ক সম্পর্কে এই ভ্রমণকাহিনীর বিশেষ গুরত্ব সৃষ্টি করেছে।

এরপর হিউয়েন সাঙ ষষ্ঠ -সপ্তম খৃস্টাব্দে ভারতে ভ্রমণ করেন ও ভ্রমণকাহিনীও লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর দীর্ঘ ১৩ বছর ভারতবাসের ফলে রচিত দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনী ভারতের ইতিহাসে সমৃদ্ধ উপাদান সকলের কাছেই চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

এইসব ভ্রমণকাহিনীর প্রসঙ্গ একারণেই বলছি যে আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে ভ্রমণ সাহিত্যের গুরুত্ব আছে। এবং তা শুধু সমকালেই নয় ভবিষত্যের তার প্রাসঙ্গিতা এবং গুরত্ব যথেষ্ট বেশি।

ভারতবর্ষে নানাস্থানে ভৌগলিক বিভিন্ন দর্শণীয় স্থান যেমন আছে তেমনি অনেক ধর্মস্থানও আছে সেখানে খুব জনসমাগম ঘটে। এই স্থানগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থান মাহাত্ম্য এবং নানা কিংবদন্তী । সেই কিংবদন্তীর সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় কাহিনী আধ্যাত্মিকচেতনার গল্পও জেনে রাখা এবং প্রয়োগ করার দরকার আছে। ভারতবর্ষের বিচিত্র ধর্মস্থান ঐতিহাসিক নানা কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত সেই কাহিনীর দীর্ঘ পৌরাণিক ঐতিহ্য আমাদের সমকালীন পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। আমাদের সমকালীন পর্যটকদের কাছেও বিশেষ আকর্ষণীয়। জীবনের বিচিত্র পর্যায় অনুভূতির নানা ক্ষেত্র এবং ঐতিহাসিক দার্শনিক ধর্মীয় নানা ভাবনার সম্পূর্ণ একটি বাতাবরণ রসসম্পূর্ণ করে তোলাই মূল উদ্দেশ্য। একটি সফল সার্থক ভ্রমণকাহিনী একটি চিরায়ত সাহিত্য হয়ে ওঠে। এটি একটি সৃজনমূলক সাহিত্য অথচ এর মধ্যে শুধু

নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ নয় একটি দর্শকের জীবনাভূতি, চলমান ও আকর্ষণীয় গন্তব্যপথের বিবরণ। পর্যটনের নানা খুঁটিনাটি এবং দৃষ্টির অনুভূতি এক আনন্দময় জীবনবোধ এখানে যেভাবে প্রকাশ করা যায় তা যেন হয় ভ্রমণের যথার্থ অনুভূতি এক অনির্বচনীয় প্রকাশ।

ভ্রমণকাহিনীর একটা বিশেষ গুণ হল ভ্রমণকাহিনির লেখকের সমগ্র ভারত পর্যটন করে এক জাতি এক প্রাণ একতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁদের পাঠকদের মধ্যেও এই প্রেরণা সঞ্চারের চেষ্টা করেন। পর্যটকের কাছে ভাষা ও ধর্ম কোনো বাধা নয়। পোষাক,খাদ্যাভাস ভাষা ও জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে ভারতীয়দের যে আপাত বৈষম্য আছে তা পর্যটকদের কাছে ভারতদর্শনের কোনো অন্তরায় নয়। ভ্রমণকাহিনী লিখতে গেলে পরম নির্লিপ্তার সঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের বিবরণ দিতে হবে। সবসময়ই চলমান জীবন প্রবাহকে অনুসরণ করতে হবে। ভারতের নানা ভৌগলিক পরিমন্ডল যেমন হিমালয়, নদনদী, উৎসব, পালা পার্বণ, লোকচরিত্র যেমন মেলা, লোকশিল্প, কিংবদন্তী প্রভৃতি গবেষকের মতো গভীর মনস্কতার সঙ্গে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করাই হবে মুখ্য উদ্দেশ্য। আবার অতিরঞ্জন বা অত্যুক্তিও মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং বাস্তবানুগ স্বচ্ছ তদ্‌গত বিষয়মুখ্য জীবনদৃষ্টির পর্যবেক্ষণ ও রচনা নৈপুণ্য শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনীর নির্ণায়ক।

এ কথাও মনে রাখতে হবে ভারতের অতীত ঐতিহ্য সামগ্রিকভাবে কোনো এক বিশেষ রাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ নেই। তা সমস্ত রাজ্যের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। ভ্রমণকাহিনীর লেখক তাকে খণ্ডাকরে বর্ণনা করার মধ্যে দিয়েই ইঙ্গিতে প্রকাশ করবেন তা বৃহতের অংশ, যা সমস্ত খণ্ড মিলিয়ে এক এবং অবিভাজ্য।

ভ্রমণকাহিনীর লেখক শুধু প্রাকৃতিক রুপবৈচিত্র্য বর্ণনাতেই থামেন না, বরং সেইসঙ্গে বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মানবমনকেও বিশ্লেষণ করেন ঔপন্যাসিকের চরিত্রচিত্রণ দক্ষতার সঙ্গে। ভ্রমণগাইডের থেকে ভ্রমণকাহিনীর পার্থক্য এখানেই। ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে সাহিত্যরস পরিবেশিত হয়। ভ্রমণকাহিনী সাধারণ পাঠককে বইটি পড়তে উদ্বুদ্ধ করে, তার সাহিত্য গুণের জন্য। ভ্রমণকাহিনী পড়ার পর পাঠকে উদ্বুদ্ধ করে ভ্রমণের জন্য। আবার ভ্রমণে না যেতে পারলেও ভালো ভ্রমণকাহিনী পাঠকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে এবং স্বপ্ন দেখায় যে ভ্রমণে না গিয়েও পাঠক সেই স্বপ্ন কল্পনার জগৎকে মনের মধ্যে ধারণ করেন চিরকাল।

সাহিত্যই একমাত্র পারে ভূগোল, ভাষা সংস্কৃতির মধ্যে সমস্ত ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিতে। তাই দূর অজানা মেরুপ্রদেশের অসহ জীবনযাপনের বেদনা ভুলে সেই জীবনের আশ্চর্য আকর্ষণে মেরুপ্রদেশের রহস্যময় হাতছানি ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে পাঠকের মনে মেরুপ্রদেশের দর্শণের অনুভব স্পষ্ট হয়। দূরও কাছে আসে। জীবনের এক প্রসারিত অঙ্গন রচনা করতে তাই সক্ষম হয় সার্থক ভ্রমণকাহিনী।

- পরিশেষে ভ্রমণকাহিনী লেখার জন্য কয়েকটি জরুরী বিষয়----
- বিষয় নির্বাচন-স্থান এবং তার ভৌগলিক পরিবেশ।
- যাত্রাপথ ও তার যথাযথ সরস বর্ণনা।
- স্থানের মাহাত্ম্য- ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বা নিসর্গ সন্দর্শনের গুরুত্ব।
- ভ্রমণকারীর চরিত্র, অনুভূতি, মানবিক চিন্তার স্তর পরম্পরার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ।
- সরস বর্ণনা ভঙ্গি।
- ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ভাবনার এক বিস্তৃত সৌন্দর্যময় উপস্থাপন।
- ব্যক্তি-স্থান নিসর্গ প্রতিটি ক্ষেত্রকেই জীবন্ত প্রকাশ ভঙ্গি।
- বাস্তব ও কল্পনার এক অসাধারণ মেলবন্ধন।

পুথিপাঠ ও সম্পাদনা

– ড. শান্তনু মন্ডল

১. উদ্দেশ্য
২. প্রস্তাবনা
৩. পুথি বা Manuscript কী?
৪. পুথির লিপির বিবর্তন
৫. পুথির লিখন উপকরণ
৬. বাংলা পুথির কাল নির্ণয়
৭. পুথি সংরক্ষণ
৮. পুথি সম্পদনা
৯. অনুশীলনী
১০. গ্রন্থপঞ্জি

১. উদ্দেশ্য ঃ

(ক) এই একক পাঠে পুথি কী সে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ধারণ পাওয়া যাবে।

(খ) এই একক পাঠ করলে পুথির লিপির বিবর্তন তথা বাংলা লিপির বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ হবে।

(গ) পুথি কোন কোন উপকরণের মাধ্যমে তৈরী হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব।

(ঘ) বাংলা পুথি তথা কাল জ্ঞাপন যে সমস্ত পদ্ধতি প্রচলিত সেগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যাবে এই একক পাঠে।

(ঙ) বাংলা পুতি কিভাবে করা হবে সে সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে এই একক পাঠে।

(চ) পুথি সম্পাদনা কিভাবে করা হবে সে সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে এই একক পাঠে।

২. প্রস্তাবনা ঃ

পুথি পাঠ বা Textual criticism বর্তমান বহিঃবিজ্ঞানের একটি শাখা। পুথির চর্চা প্রত্ন লিপি বা palcography-র উপর দাঁড়িয়ে। যে সমস্ত বস্তু বা material-এর উপর পুথি

লেখা হয়েছে, তার প্রকৃতি নির্ণয় করা, মূল (আসল) পুথির সন্ধান করা এই বিদ্যার গোড়ার কথা। অপরদিকে পুথি বিদ্যাচর্চায় বহুবিধ জ্ঞানের সমন্বয় দরকার। পুথি যেহেতু অতীত কালের জীবন্ত নিদর্শন তাই পুথি গবেষণায় ইতিহাস জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পুথি লেখার কর্মশালা ছিল। সেখানে পুথিতে ছবি ও নানা রঙের কারুকার্য করা থাকত। র‍্যনেস্যাঁসের সময় পশ্চিম ইউরোপীয় পুথির অলঙ্করণ, গৃহের ও গির্জার অলঙ্করণকেও প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহারে বর্ণোজ্জ্বল পুথির সংখ্যা কমতে থাকে। ছাপার আকারে লেখালেখি ও ছবির প্রচলন হয়। পুথি পাঠ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল যে পুথি দেখছি, তাই আসল পুথি কি না তা বিচার করা। সেক্ষেত্রে আদিম আদর্শ স্রষ্টার পরিচয় যথাসম্ভব জানতে হয়। পুথিটির কাল নির্ণয় করতে হয়, পুথির বিষয়বস্তু জানতে হয়। ভাষাতত্ত্ব এবং লিপিতত্ত্ব এই রূপ অধ্যয়নের দুই প্রধান মাত্রা। সঙ্গে সঙ্গে জানতে হয় গ্রন্থকারের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

মনে রাখতে হবে যে কোন পুথিই অত্যন্ত মূল্যবান। খন্ড করে পুথির প্রত্যেকটি অক্ষর, প্রত্যেকটি শব্দ পড়া দরকার। পাঠের শুদ্ধতা অশুদ্ধতা অবশ্যই সর্বদা বিচার্য। কেননা পুথি থেকে উৎসারিত হয় ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, পদ্ধতিবিষয়ক জ্ঞান এবং সর্বপরি নির্মোহ বিচার বুদ্ধি। পুথি সর্বতভাবে জ্ঞানের ভান্ডার।

৩. পুথি বা Manuscript কী ঃ

লিপির উদ্ভবের পর থেকে প্রাচীন সাহিত্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা সবই হাতে লেখা। হস্তলিখিত এই সাহিত্যকৃতি সময়ানুসারে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন যুগে একে বলা হত পুস্তক। পুস্তক শব্দ এসেছে 'পোস্ত' বা 'প্রস্ত' শব্দ থেকে। 'পোস্ত' শব্দের অর্থ চামড়া। চামড়া অর্থাৎ পোস্ত -এর উপর প্রথম লেখা হত বলে প্রাচীনযুগে সাহিত্যকৃতিকে বলা হত পুস্তক। পুস্তক সংস্কৃত শব্দ। এই পুস্তক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয় 'পুথি' শব্দটি।

পুথি শব্দটি খুব প্রাচীন নয়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোনো এক সময়ে রচিত প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ-এর চল্লিশ সংখ্যক পদে শব্দটির রূপ পাওয়া যায়–

"জো মণগোত্রর আলাজালা।
আগম পোথী টন্টামালা।।

ভণ কইসে সহজ বোলবা জাঅ।

কাঅবাকচিতা জসু ণ সমাঅ।।”

পুথি শব্দের অপভ্রংশ রূপ ‘পোথী’ চর্যাপদে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা ভাষায় প্রথম। পুথি শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ গ্রন্থে জানিয়েছেন– “বি [সং পুস্তিকা > প্রা পুত্থিয়, আ > বা পুথি,– থী: হি, প্য, ঠ, গু, মৈ, সি, ড় পোথী; অস, পুথি, থী] ১. (প্রায়ই প্রাচীন) হস্ত লিখিত পুস্তক..... ২. গ্রন্থ পুস্তক ..... ৩. সন্দর্ভ। পুথি শব্দের অনুনাসিকতা বুৎপত্তিগত নয়, প্রয়োগগত অভ্যাস মাত্র। পরবর্তীকালে প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে পুথি শব্দটি নানা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকী রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান জাতীয়, কাব্য গুলিও পুথি সাহিত্য নামে পরিচিত।

এখন দেখে নেওয়া যাক পুথি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে আর কী কী শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে ‘পুথি’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘পুস্তক’ শব্দ থেকে। আর অর্থও আলোচনা করা হয়েছে পূর্বে। এই পুস্তককে গ্রন্থ নামেও অভিহিত করা হয়। গ্রন্থ শব্দটি এসেছে “✓গ্রন্থ্+ অ [ঘঞ-ভা]” থেকে – যা অর্থ গাঁথা। প্রাচীনকালে পুথি রক্ষাবেক্ষণের জন্য পুথির প্রতিটি পাতায় মাঝখানে ছিদ্র করে উপরে ও নিচে শক্ত পাটা দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হত। পাটা ও দড়ি দিয়ে পুথিগুলোকে গ্রন্থন করে রাখা হত বলে পুস্তককে বা পুথিতে গ্রন্থও বলা হত।

‘পান্ডুলিপি’ পুথি শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। ‘পান্ডুলিপি’ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল [পান্ডুপেণ্ড + উ - কর্মবা] শুক্লপীতবর্ণ বা ধূষর বর্ণ লিপি। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দেখা যায় অধিকাংশ বস্তুই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পান্ডুর বা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। প্রাচীনকালে পশুচর্ম, ভূর্জপত্র, তাল ও তেরেট পাতা প্রভৃতি বস্তু সাহিত্যকৃতির বা লেখার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হত। অনুমান করা হয় এইসব উপাদানকে লেখার উপযোগী হিসেবে তৈরী করতে প্রথমে কিছুটা শুকিয়ে নিতে হত। আর তখন তা দেখতে হত অনেকটা তামাটে বর্ণের। পরে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এই সব উপাদান সম্পূর্ণরূপে পান্ডুবর্ণ ধারণ করত। প্রাচীন গ্রন্থাদি এরূপ পান্ডু বর্ণের উপাদানে লিখিত হত বলেই একে বলা হত পান্ডুলিপি।

পান্ডুলিপি শব্দটি কোন সময় থেকে প্রথম ব্যবহৃত হয়ে আসছে তা এক কথায় বলা যায় না। অনুমান করা যায় এই শব্দটির প্রচলন হয়েছে এদেশে ইংরেজদের আগমনের পরে। ইংরেজি 'Manuscript' শব্দটির অর্থ হস্তলিখিত গ্রন্থ বা দলিল অথবা ছাপানোর জন্য হস্তলিখিত বা

টাইপ করা লিপি, অর্থাৎ পান্ডুলিপি। ড. মদনমোহন গোস্বামীর মতে "পুঁথি বলতে আমরা আধুনিক পূর্বযুগের পান্ডুলিপিকে বুঝিয়া থাকি। আধুনিক যুগে আমরা পুঁথি বলি না, বলি পান্ডুলিপি বা ইংরেজিতে 'Manuscript'। 'Manuscripts' শব্দটির অর্থ হস্তলিখিত; written by hand; পান্ডুলিপি হস্তলিখিত পুস্তক বা কাগজ : a book or paper written by hand; এখনও ছাপা হয়নি এমন: Not yet printed। 'Manuscript' শব্দটি লাতিন 'manus'– যার অর্থ হাত এবং 'scriberc' – যার অর্থ আঁচড় কাটা– শব্দ দুটির সমন্বয়ে তৈরী হয়েছে। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় হাতে লেখা বিশেষ ভাষায়, বিশেষ লিপিতে, সুনির্দিষ্ট কোনো স্থান, এলাকা এবং সময়ে লিখিত গ্রন্থরূপ হচ্ছে পুথি। বর্তমানে ন্যাশনাল ম্যানাস্ক্রিপ্ট মিশন ঠিক করে দিয়েছে কমপক্ষে পঁচাত্তর বছরের পুরনো হাতে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থকেই পুথি বলা যাবে।

আমরা জানি প্রাচীনকালে ব্যবহৃত সংস্কৃত 'পুস্তক' শব্দটি 'বই' অর্থে বর্তমানেও প্রচলিত। মধ্যযুগের 'গ্রন্থ' শব্দটিও 'বই' অর্থে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু 'পুথি' ও 'পান্ডুলিপি' শব্দ দুটি মধ্যযুগে যে অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাক না কেন, বর্তমানে তা ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'পুথি' শব্দের মূল অর্থ 'হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক'। আর পান্ডুলিপি শব্দের অর্থ 'পান্ডু বা ধূসর বর্ণের উপাদানে হস্ত লিখিত লিপি'। এ দুটি শব্দের মূল অর্থের মধ্যে ব্যবধান থাকলেও বর্তমানে দুটি শব্দ একই অর্থে বা প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ হাতে লেখা যে কোন প্রাচীন গ্রন্থকেই এখন পুথি বা পান্ডুলিপি বলে ধরা হয়।

৪. পুথির লিপির বিবর্তন ঃ

এই পর্বে আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলা পুথির লিখন কৌশল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখার মত যে বেশিরভাগ বাংলা পুথি বাংলা লিপিতে লেখা হলেও দেবনাগরী, নেওয়ারী, ওড়িয়া, আরবি, সিলেটি নাগরী লিপিতেও বাংলা পুথি লেখা হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠে আসবে যে বর্তমানে বা প্রাচীনকালে যে লিপি দেখছি তার জন্ম কবে? এই লিপির জন্ম হঠাৎ করে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে হয়নি। যুগ যুগ ধরে বিবর্তন-পরিবর্তন আর হাজারো একান্তিক চেষ্টার ফলে আজ তা বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। লিপিকে বর্ণমালা বা বর্ণলিপিতে পৌঁছতে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেকগুলি স্তর। সেই স্তরগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক) গুহাচিত্র ঃ প্রায় কুড়ি হাজার বছর আগে আঁকা গুহাচিত্রগুলি থেকেই লিপির জন্মের সূচনা। গুহাগাত্রে বা প্রস্তর ফলকে চিত্রঙ্কনের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা হত। এই পদ্ধতিতে একটি চিত্রের দ্বারা প্রকাশ পেত একটি পূর্ণ বাক্য। এক একটি চিত্র এক একটি বার্তা বহন করত।

খ) নুড়ি বিন্যাস ঃ প্রাচীনকালে কিছু আদিম জনজাতি বিভিন্ন রঙের পাথরের সাহায্যে এবং নুড়ির সজ্জার পরিবর্তন করে ভাব প্রকাশ করত।

গ) গ্রন্থিলিপি ঃ দড়িতে গিঁট বেঁধে তার সাহায্যে ঘটনা মনে রাখার জন্য 'কুইপু' নামে এক আশ্চর্যজনক 'গ্রন্থিলিপি' ব্যবহার করত প্রাচীন কালের মানুষেরা।

ঘ) চিত্রলিপি ঃ আদীমকালে মানুষ তার চোখে দেখা বিভিন্ন বিষয় পাহাড়ের গায়ে, গুহায় এঁকে রাখত। শিকারের ছবি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছবি ইত্যাদি। ছবির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশের এই মাধ্যমকে চিত্রলিপি বলা হয়।

ঙ) চিত্রপ্রতীক লিপি ঃ চিত্রলিপি স্তরের পরবর্তী স্তর এটি। মনের ভাব প্রকাশের জন্য ছবির সাহায্যে নেওয়া বাস্তবেই অনেকটা সময় সাপেক্ষ বিষয়। চিত্রলিপিগুলি তাই এই পর্যায়ে এসে ভাবের নামবাচক বা ধ্বনির প্রতীক হয়ে উঠে। অনেকটা সাংকেতিক চিহ্নে রূপান্তরিত হয়ে চিত্রিত হয়ে থাকে চিত্র প্রতীক লিপি।

চ) ভাললিপি ঃ এই পর্যায়েরও চিত্রের দ্বারাই ভাব প্রকাশ করা হত। তবে এই পর্বের চিত্রাঙ্কন অনকেটাই সরল। চিত্রলিপি পর্বে যে বৃত্ত চিত্র সূর্য নির্দেশ করত এই পর্বে এসে তা হয়ে গেল উত্তাপ বা আলোর প্রকাশক।

ছ) শব্দলিপি ঃ এরপর যখন ছবির সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক দূরবর্তী হয়ে এল তখন ছবির উচ্চারণকে বোঝানোর চেষ্টা করা হল। এখানে একটি ছবি জুড়ে শব্দ তৈরী করা হত, যার অর্থের মধ্যে সেই ছবির বিষয়টা নেই।

জ) ধ্বনিলিপি ঃ চিত্র প্রতীক লিপির পরবর্তী পর্যায়ে চিত্র প্রতীকগুলি শব্দের প্রতীক না হয়ে ধ্বনির দ্যোতক হয়ে উঠল তখন তাকে ভাষাতত্ত্ববিদরা নাম দেন ধ্বনিলিপি।

চিত্রলিপি থেকে ধ্বনি লিপিতে উত্তরণের বিভিন্ন স্তর, সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার লিপির অবয়ব পরিকল্পিত হয়েছে। পৃথিবীর যে সমস্ত লিপির প্রচলন আছে সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা –

১) অপঠিত বা অশ্রেণিবদ্ধ লিপি

২) সুমেরীয় বানমুখ বা কিলকাকার লিপি

৩) চিনীয় চিত্রলিপি

৪) মিশরীয় চিত্রপ্রতীক লিপি

৫) সম্ভাব্য ভারতীয় লিপি

আমরা এখানে শুধুমাত্র সম্ভাব্য ভারতীয় লিপির কথা আলোচনা করব। মনে রাখতে হবে আমরা বাংলা ভাষার পুথিচর্চা নিয়ে আলোচনারত ফলে বাংলা লিপির কথায় এখানে আলোচিত হবে। আর বাংলা লিপির আলোচনা করতে গেলে আমাদের শুধুমাত্র দরকার সম্ভাব্য ভারতীয় লিপির প্রসঙ্গ।

ভাষাবিজ্ঞানীরা তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাবগুলিকে বিচার করে বারোটি ভাষাবংশের বিভাজন করেছেন। সেই ভাষা বংশের অন্যতম ভাষাবংশ হল সেমীয় হামীর ভাষাবংশ। সেই সেমীয় হামীয় ভাষাবংশ থেকে দীর্ঘকালব্যাপী নানা বিবর্তনের মধ্যদিয়ে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে। বিষয়টি সংক্ষেপে ও স্পষ্ট করে বোঝার জন্য রেখাচিত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে –

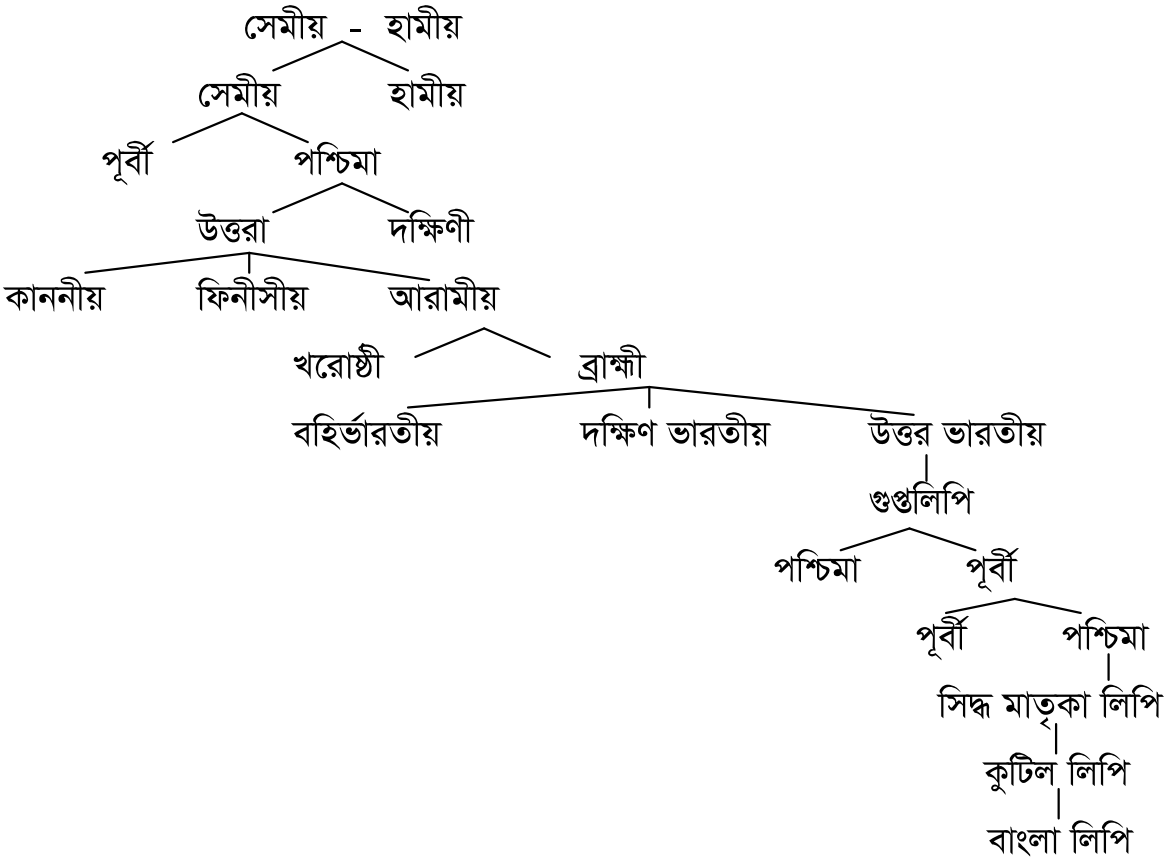

খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়। এখানে বাংলা ধ্বনিগুলির বিবর্তন দেখানো হল–

চিত্র-১

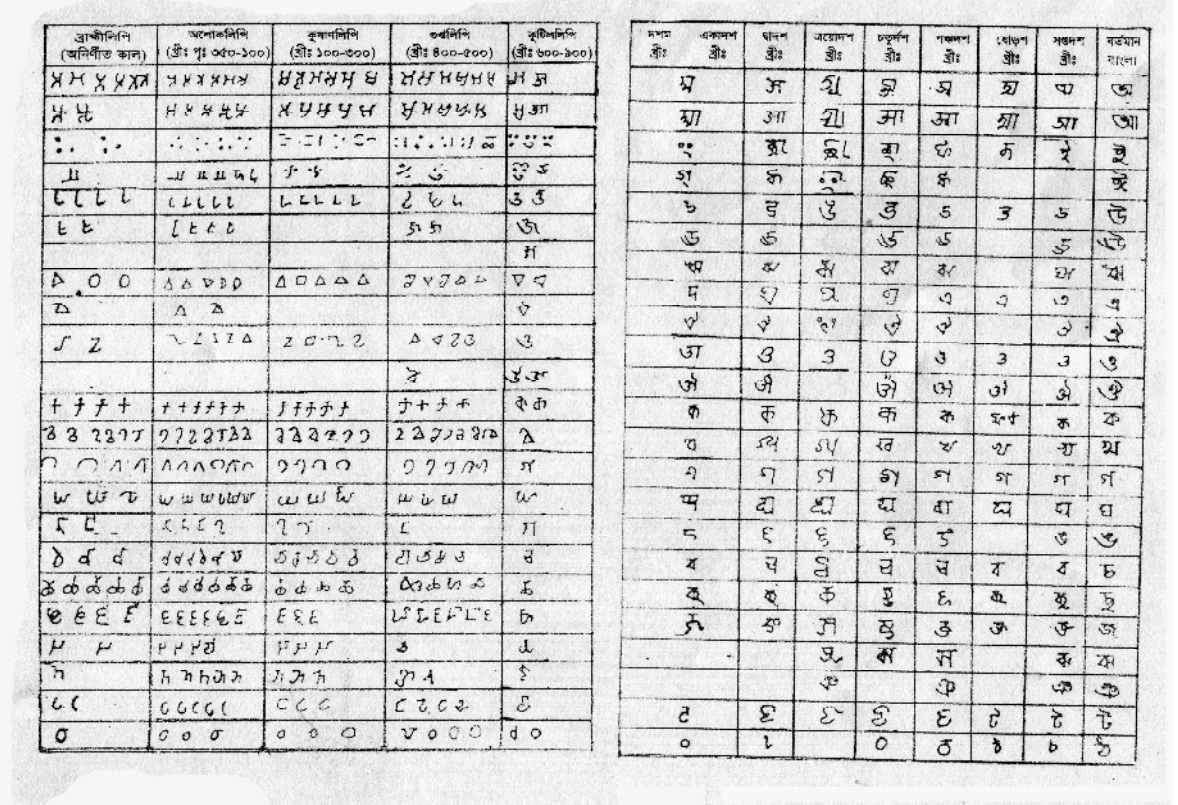

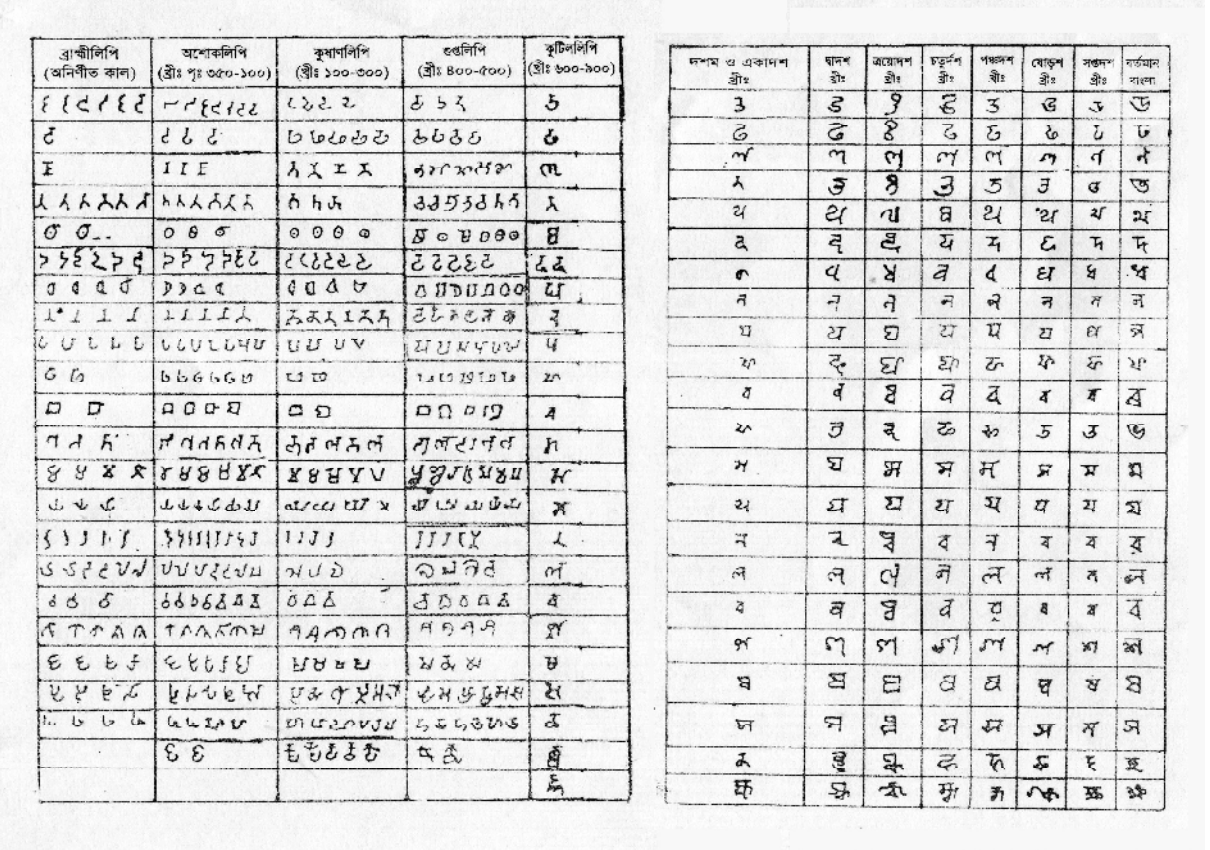

এছাড়াও প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুথি নির্ভর সাহিত্যে পত্রসংখ্যা ও গীতসংখ্যা নির্দেশ করতে সংখ্যা সূচক লিপির ব্যবহার হয়েছে। যথা–

১ – আধুনিক ১ এর মত

২ – আধুনিক ২ এর কাছাকাছি

৩ – 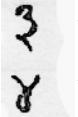 নাগরী ৩ এর মত

৪ – নাগরী ৪ এর মত

৫ – ইংরেজি 5 এর মত

৬ – মনে হয় আধুনিক ৬, চর্যার ৬ এরই পরিশীলিত রূপ

৭ – অনেকটা আধুনি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত বলা যায়। আধুনিক বাংলা ৭ চর্যার ৭ এর পরিণত রূপ

৮ – অনেকটা বাংলা ‘চ’ এর মত। আধুনিক বাংলা ৮ যেন চর্যার ৮এর পরিবর্জিত ও পরিযোজিত রূপ।

৯ – আধুনিক ৯ এর সঙ্গে অভিন্ন

১০ - 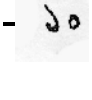 ১০ আধুনিক বাংলারই অনুরূপ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এখনো পর্যাপ্ত প্রাপ্ত আদি নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কাব্যটি বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লাভ মহাশয় কঁকিল্যা গ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্যের বাংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘর থেকে আবিষ্কার করে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকৌশল আলোচনা করা যেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণমালার একটি রূপ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক অমিত্রসুদন ভট্টাচার্য মহাশয় ‘বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র’ গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ গ্রন্থে ণ, ন, ল লিপিগুলির আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য পার্থক্য ফটোচিত্র সহযোগে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন া-কার, ি-কার, বিভিন্ন লিপিকলার বিষয়ে।

এখানে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণমালার লিপিরূপ তুলে ধরা হল –

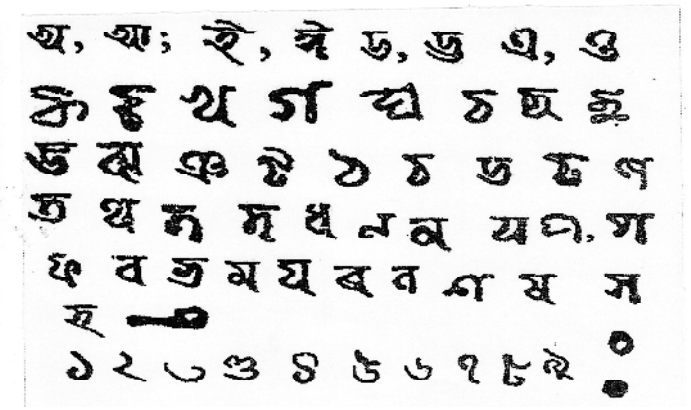

চিত্র-২

৫. পুথি লিখন উপকরণ ঃ

ভারতবর্ষের লিখন পদ্ধতির ক্রম-বিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সীলমোহর, তাম্রফলক, ধাতবপত্র, পাথর, কাষ্ঠফলক প্রভৃতি উপকরণে লিখন প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমানে প্রাপ্ত পান্ডুলপিগুলি দেখা যায় তালপত্র, ভূর্জপত্র, তেরেটপত্র, কদলীপত্র, বৃক্ষবল্কল, তুলট, কাগজ, হাতে তৈরী পাতলা কাগজ প্রভৃতি উপদানে প্রস্তুত।

ভূর্জপত্র ঃ ভূর্জপত্র পাওয়া যেত হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে। ভূর্জপত্র বার্চ জাতীয় গাছের বাকল ও ভেতরের ছাল থেকে সাধারণত তৈরী করে নেওয়া হত।

তালপাতা ঃ প্রথমে কাঁচা তালপাতা কিছুদিন জলে ভিজিয়ে রেখে পরে রৌদ্রে শুকানোর পরে যখন তামাটে বর্ণ ধারণ করত তখন তা লেখার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হত। তালপাতা দু'রকমের– খড়তাড় আর শ্রীতাড়। শ্রীতাড়কে তেরেট পাতা বলা হত। পুথির জন্য তেরেট পাতা সবথেকে সুবিধাজনক।

গাছের ছাল ঃ প্রথমে গাছের কাঁচা পুরু ছাল চেঁছে মসৃন ও পাতলা করা হত। পরে তা উত্তমরূপে শুকিয়ে লেখার উপদান হিসাবে ব্যবহার করা হত। শুকানোর পরে এ উপাদানটিও ধারণ করত তামাটে বর্ণ।

তুলট কাগজ ঃ দেশীয় বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা মানুষের হাতেই তৈরী হত এই উপাদানটি। এই কাগজ তৈরীতে প্রথমে শন, তুলা ও তিসির তন্তু একত্রে ঢেঁকিতে পেষন করে মন্ড তৈরী করা হত। পরে তা সম্ভবত কাপড়ে পাতলা করে বিছিয়ে রোদে শুকনো হত। তুলট কাগজে তুলার পরিমাণ বেশি থাকত বলে একে বলা হত তুলট কাগজ।

কালি ঃ পুথির আলোচনায় লেখপত্রের পর অনিবার্যভাবে এসে পড়ে কালির কথা। সাধারণত পুথিতে ব্যবহৃত হত কালো বর্ণের কালি। তবে লাল ও তাম্রবর্ণের কালিও ব্যবহৃত হত। পুথি সম্পাদককে পুথির কালি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। প্রাচীন পুথিতে শ্লোকের আকারে কালি তৈরীর উপকরণগুলি লেখা থাকত। কালি তৈরী করার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হত শিমুল গাছের ছাল, ছাগলের দুধ, তেল, লোধ্র, লাক্ষা, লোহার গুঁড়া, ভূষা কালি, বিভিন্ন গাছের ছাল, আমলকী, হরিতকী ইত্যাদি।

লেখনী ঃ লেখনী তৈরী করা হত পাখির পালক, খাগড়া জাতীয় গাছের ডাঁটা, নল, বাঁশের কঞ্চি, গাছের শাখা সূচলো করে কেটে নিয়ে। অনেক সময় লোহার পেরেক জাতীয় পদার্থও ব্যবহৃত হত।

লিখন সহায়ক উপকরণ ঃ লিখন সহায়ক উপকরণ হিসেবে যে উপকরণ ব্যবহৃত হত সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. সীসার চাকতি – এটির সাহায্যে পংক্তির সরল রেখা টানা হত।

২. একটি রুলার – এটি ব্যবহৃত হত কলম বা স্তম্ভের মাপ সোজা রাখার জন্য।

৩. একটুকরো স্পঞ্জ – ভুল করে লেখা অংশ মুছে ফেলার জন্য।

৪. ঝামা পাথর – নিব মসৃন বা কাগজের খসখসে ভাব দূর করার জন্য।

৫. ছুরি – কলমের মুখ ধার করা জন্য।

৬. কলমদানী – এই সমস্ত কিছু রাখার জন্য ' ' জাতীয় কলমদানী ব্যবহৃত হত।

৬. বাংলা পুথির কাল নির্ণয় ঃ

বংলা পুথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে পুথির কাল নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিয়ষ। কারণ এখান থেকেই নির্ণয় করা সম্ভব পুথিটি কবে রচিত হয়েছিল। কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে অনেক জটিলতা; কেননা প্রাচীন ও মধ্যযুগে খ্রিষ্টাব্দ এবং বর্তমান বাংলা সনে লিপিকাল সাধারণত লেখা হত না। সে সময় শকাব্দ, বঙ্গাব্দ, সম্বৎ, মখি, অব্দ ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। পুথির কাল পরিচয় মূলত পুথির পুস্পিকা এবং ভনিতা অংশ থাকত। এছাড়া নানান ঘটনাবাচক নিরিখ থেকেও কাল নির্ণয় করা যায় – গাণিতিক সংখ্যার সাহায্যে এবং সংখ্যা বাচক হেঁয়ালীপূর্ণ শ্লোকে প্রতীকী শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে। পুথি রচয়িতারা যুগভেদ এবং শাষনকতা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ

করতেন। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে খ্রিষ্টাব্দের প্রচলন সর্বাধিক। এজন্য বিভিন্ন অব্দ কীভাবে খ্রিস্টাব্দে রূপান্তরিত করা যায় তা তালিকার মাধ্যমে দেখে নেব।

- শকাব্দ + ৭৮ = খ্রিস্টাব্দ
- বঙ্গাব্দ + ৫৯৩/৪ = খ্রিস্টাব্দ
- মল্লব্দ + ৬৯৬ = খ্রিস্টাব্দ
- সম্বৎ + ৫৭ = খ্রিস্টাব্দ
- মঘীঅব্দ + ৬৩৮/৩৯ = খ্রিস্টাব্দ
- চৈতন্যাব্দ + ১৪৮৫ = খ্রিস্টাব্দ
- লক্ষণাব্দ + ১১১৮ = খ্রিস্টাব্দ
- পালাব্দ + রাজাভেদে বিভিন্ন = খ্রিস্টাব্দ
- দনিশাব্দ + ১৭৫০ = খ্রিস্টাব্দ
- ত্রিপরাব্দ + ৫৯০ = খ্রিস্টাব্দ
- নসরত শাহী সন + ১৫১৯ = খ্রিস্টাব্দ
- নেপাল সংবৎ + ৮৮০ = খ্রিস্টাব্দ
- পরগণাতি অব্দ + ১২০২/৩ = খ্রিস্টাব্দ
- পরগণাতি অব্দ = বঙ্গাব্দ + ৫৯৩ = খ্রিস্টাব্দ
- জমিদারী সন + ৬৯৩/৯৪ = খ্রিস্টাব্দ
- গুপ্ত সংবৎ + ৩১৯ = খ্রিস্টাব্দ
- চৈত্রাদি বিক্রম সংবৎ + ৫৬/৫৭ = খ্রিস্টাব্দ
- সিংহ সংবৎ + ১১১৩/১৪ = খ্রিস্টাব্দ
- বিলায়তী সন + ৫৯২ = খ্রিস্টাব্দ
- ইলাহী সন + ১১৫৫ = খ্রিস্টাব্দ
- দক্ষিনী ফসলী সন + ৫৯০ = খ্রিস্টাব্দ
- উত্তরী ফসলী সন + ৫৯২ = খ্রিস্টাব্দ
- শাহুর সন + ৫৯৯ = খ্রিস্টাব্দ
- আমলি/ অমলি সন + ৫৯৩/ ৪ = খ্রিস্টাব্দ

- হর্ষ সংবৎ + ৬২৩/২৪ = খ্রিস্টাব্দ
- ভাটিক সংবৎ + ৬২৩/২৪ = খ্রিস্টাব্দ
- চালুক্য বিক্রম সংবৎ + ১০৭৫ = খ্রিস্টাব্দ
- কলচুরি সংবৎ + ২৪৮/৪৯ = খ্রিস্টাব্দ
- যবন নৃপতি শকাব্দ + ৫৯৩/ ৪ = খ্রিস্টাব্দ
- কোল্লম সংবৎ + ৮২৪/২৫ = খ্রিস্টাব্দ
- বীর নির্বাণ সংবৎ – ৫২৭ = খ্রিস্টাব্দ
- লিচ্ছবি অব্দ +১১০ = খ্রিস্টাব্দ
- কালকুরিকেড়ি অব্দ + ২৪৮ = খ্রিস্টাব্দ

৭. পুথি সংরক্ষণ ঃ

পুথি পাঠ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে পুথি সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংরক্ষনের অভাবে যদি পুথি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সম্পাদনার কোনো প্রশ্ন আসে না। পুথি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে 'সন্তানের মত পালাবে/ শত্রুর মত বাঁধবে।' পুথিগুলি সাধারণত লেখা হয়ে থাকে তালপাতা বা তেরেটপাতা এবং তুলট কাগজে আর এই উপাদানের কথা স্মরণ রেখেই পুথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সেজন্য প্রথমে পুথি বিনষ্টকারী বিষয়গুলি চিহ্নিত করা দরকার –

ক) পরিবেশগত কারণ ঃ আদ্র জলবায়ু পুথি নষ্টের কারণ। বায়ুমণ্ডলের আপেক্ষিক আদ্রতা শতকরা সত্তোর ভাগ বা তার কাছাকাছি হলে পুথি হলুদ রং ধারণ করে ও নষ্ট হয়ে যায়। আবার তাপমাত্র যদি ৩২° সেন্টিগ্রেডের বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও পুথির পাতা ভেঙ্গে যায়। এছাড়াও অত্যধিক চড়া বৈদ্যুতিক আলো পুথি নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট।

খ) রাসায়নিক কারণ ঃ রাসায়নিক অম্লতা পুথির ক্ষতি করে। কালি তৈরীর সময় লোহার চূর্ণ মেশানো হয়, সেই লোহার চূর্ণ অম্লতার কারণ। অ্যাসিডের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ার ফলে তালপাতার সেলুলোজের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যায় ফলে পুথির পাতা নষ্ট হয়ে যায়।

গ) জৈবিক কারণ ঃ জৈব শত্রু বলতে যে সমস্ত পুথি নষ্টের কারণ সেগুলিকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। আরশোলা, সাদা পিঁপড়ে, বুক লাইস, সিলভার ফিস, ছাড়পোকা, ইদুর এদের মধ্যে অন্যতম।

ঘ) অনুজৈবিক কারণ ঃ অনুজৈবিক কারণের অন্যতম ছাত্রাক। ছত্রাক স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতেই জন্মায়। ভারতীয় পুথিগুলি মূলত অ্যাসপারগিলাস নিগার, সেজোনেওয়াম, রুবরাম প্রভৃতি ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়।

ঙ) দূর্ঘটনাজনিত কারণ ঃ পুথি কোনো কারণে জলে ভিজে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার আগুনেও পুড়ে যেতে পারে।

চ) অপব্যবহার জনিত কারণ ঃ কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত কারণে অযত্নের ফলে পুথি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ছ) অব্যবহার জনিত কারণ ঃ অপব্যবহারের মত অব্যবহারও পুথি নষ্টের কারণ। দীর্ঘদিন ব্যবহার না করার জন্য বা পূজো আর্চা ইত্যাদির ফলে দীর্ঘদিন চাপ দিয়ে বেঁধে রাখার জন্য পুথি নষ্ট হয়ে যায়।

এতো গেল পুথি কীভাবে নষ্ট হয় তার কথা। এবার জেনে নেওয়া যাক পুথি কীভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় সেই বিষয়ে। পুথি সংরক্ষণের বেশ কয়েকটি বিজ্ঞানসম্মত ও সচেতনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন–

ক) অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ঃ আদ্র ও স্যাঁতস্যাঁতে জলবায়ু থেকে পুথিকে রক্ষা করার জন্য ৫৫°-৬০° আদ্রতার মধ্যে ও ২০°-২৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে পুথি সংরক্ষিত করে রাখতে হবে।

খ) জৈবিক ও অনুজৈবিক সমস্যার প্রতিরোধ ঃ পোকামাকড় ও বিভিন্ন প্রাণীর থেকে পুথিতে রক্ষার জন্য ঘরোয়া টোটকা ও মিথাইল অ্যালকোহল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গ) রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ অম্লতা দূর করার জন্য ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবন, মিথাইল অ্যালকোহল, প্যারাডাইক্লোরোবেঞ্জিন ও তরল অ্যামোনিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে পুথির পাতা থেকে ক্ষার নষ্ট হয়ে যায়।

ঘ) অপব্যবহার ও অব্যবহার রোধ ঃ পুথি ব্যবহার করার সময় ব্যবহারকারী সুগভীর মনোযোগ এবং সতর্কতা অত্যন্ত জরুরী। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে পুথি সংরক্ষনের নামে ফেলে রাখাও উচিত নয়। ব্যবহার করলে পুথি ভালো থাকে।

যে সমস্ত পুথি অপব্যবহার বা অব্যবহারের কারণ নষ্ট হয়ে গেছে সেই সমস্ত পুথিগুলিকে ভবিষ্যতে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য পুথি মেরামতের প্রয়োজন হয়। পুথি মেরামত করারও কয়েকটি পদ্ধতি আছে। সেগুলি হল–

ক) সেঁটে রাখা ঃ যে পুথি একদিকের পাতায় লেখা সেই পাতাগুলি আঠা দিয়ে হ্যান্ডমেড পেপারে সেঁটে রাখা হলে পুথি নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানো সম্ভব।

খ) টিস্যু মেরামত ঃ যে সব পুথি খুববেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি বা খুব একটা বিবর্ণ হয় নি সেগুলি টিসু পেপার ব্যবহার করে মেরামত করা হয়ে থাকে।

গ) শিফন মেরামত ঃ যে সমস্ত পুথি পোকায় কেটেছে এবং কালিও বিবর্ণ সেক্ষেত্রে শিফন দিয়ে মেরামত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পুথির অবাঞ্ছিত দাগ মুঝে ফেলতে হবে। শিফন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাদা শিফন ব্যবহার করা অবশ্য দরকার।

ঘ) ল্যামিনেশন ঃ ল্যামিনেশন পুথি সংরক্ষনের সর্বশেষ পদ্ধতি। যেসব পুথির কালি জলে দ্রাব্য সেসব পুথি অত্যন্ত সুচারুভাবে ল্যামিনেশন করা হয়।

ঙ) স্ক্যানার পদ্ধতি ঃ যে সমস্ত পুথি প্রায় ব্যবহার অযোগ্য বা বারবার ব্যবহার করার ফলে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যায় সেগুলিকে স্ক্যান করে বা মাইক্রো ফ্লিম করে Soft copy করে রাখা হচ্ছে বর্তমানে। এই পদ্ধতিটি বর্তমানে আধুনিকতম।

৮. পুথি সম্পাদনা ঃ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যচর্চা সুন্দরভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আধুনিক পাঠকের প্রয়োজন সেই সাহিত্যগুলির সুসংহত ও বিশ্বস্ত পাঠ। আর তখনই প্রয়োজন পড়ে সম্পাদনার। একজন পুথি সম্পদকের প্রথম এবং প্রধান কাজ গ্রন্থকারের অনুমোদিত মূল গ্রন্থটির পাঠ উপস্থাপন। পুথি সম্পাদনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল যাকিছু প্রাচীন তা রক্ষা করা এবং সেই সাহিত্যের পঠন-পাঠন সমালোচনার পরম্পরা অক্ষুন্ন রাখা। যে সমস্ত প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়েছে

তার ধরন প্রধানত দুই রকমের– ক) রচয়িতার নিজের লেখা বা তাঁর তত্ত্বাবধানে লেখা স্বাক্ষরিত পুথি খ) অনুলিখিত প্রতিলিপি করা পুথি।

পুথি রচয়িতার নিজের হাতে লেখা পুথি দুষ্প্রাপ্য। সেই সঙ্গে যে সমস্ত পুথির প্রতিলিপি একটি সেখানেও সমস্যা কম। কিন্তু যে সমস্ত পুথির একাধিক অনুলিখিত রূপ পাওয়া যায় সেগুলি সম্পাদনা করতে সম্পাদককে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। কারণ সেই সমস্ত পুথি নানা কারণে পাঠভেদ থাকতে পারে। সেই কারণগুলি হল– ১) বিপর্যয়, ২) সংযোজন ৩) মিশ্রন ৪) পরিমার্জণ। অর্থাৎ বিপর্জিত হয়ে সংযোজিত হয়ে মিশ্রিত হবে বা পরিবর্জিত হয়ে উপস্থাপিত হতে পারে।

পুথি সম্পাদনার পদ্ধতি ঃ সম্পাদক পুথি সম্পাদনার সময় কয়েকটি পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারেন।

ক) আক্ষরিক অনুবাদ ঃ সে সমস্ত পুথির একটি মাত্র প্রতিলিপি পাওয়া গেছে সেই সমস্ত পুথিগুলি সম্পাদনার সময় সাধারণত আক্ষরিক অনুবাদ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

খ) সংশোধিত পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে লিপির পুথি নকল করার সময় যে সময় ভুল অর্থাৎ বিপর্যয়, সংযোজন, মিশ্রন ও পরিবর্তন করেন সম্পাদক সেগুলিতে যথাযথভাবে সংশোধিত করে সম্পাদনা করে থাকেন।

গ) সমন্বয় পদ্ধতি ঃ এই ধরণের সম্পাদনা পদ্ধতিতে একাধিক প্রতিলিপির পাঠ সংযোজন করে সমন্বয় সাধন করা হয়। এক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচার পদ্ধতির সাহায্যে ভালো পাঠটিকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

ঘ) আদর্শ পুথিভিত্তিক সম্পাদনা ঃ এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পুথিগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করে একটি পুথিকে আদি প্রত্নরূপ হিসেবে নির্বাচন করে সম্পাদিত পাঠে সেই পুথিটিকে মূল বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন।

উক্ত বিষয়গুলিকে সামনে রেখে পুথি সম্পদক পুথি পাঠ করে সেই পুথিকে গ্রন্থে রূপদান করবেন। কিন্তু এখানে আরো বেশ কয়েকটি বিষয় সম্পাদককে মাথায় রাখতে হবে তা হল–

ক) সম্পাদক অবশ্যই কঠিন ও দূরুহতর পাঠকে গুরুত্ব দেবেন।

খ) তোলা পাঠকে গুরুত্ব দেবেন। সাধারণত যে পুথিগুলি বহুবার ব্যবহৃত হত সেগুলিতে তোলাপাঠ পাওয়া যায়।

গ) প্রক্ষিত পাঠ সনাক্ত করতে হবে। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লিপি কারেরা অনেক সময় মূল পুতির মধ্যে নিজেদের গল্প, কবিতা সংযোজন করে দিতেন। সেগুলিতে আলাদা করে চিহ্নিত করে বাদ দিয়ে সম্পাদক পুথি সম্পাদনা করবেন।

ঘ) জাল পুথি বিচার – মধ্যযুগে অনেক জাল পুথি পাওয়া যায়। অর্থাৎ এমন পুথি বা এমন দেবদেবী বা লেখাকে আশ্রয় করে রচিত পুথি যার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই বা যিনি লিখেছেন তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। সম্পাদককে সেইগুলি বিচার করে দেখে নিতে হবে। তিনি দেখে নেবেন এমন একজনের পুথি সম্পাদনা করছেন তার আদৌ বাস্তব ভিত্তি আছে কী না।

ঙ) সঠিক পাঠ নির্ণয় –পুথি সম্পাদক মূল পুথির কোন একটা অংশ ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। এমনটা হতেই পারে। সেক্ষেত্রে তিনি কোন মনগড়া কথা বলবেন না। তাকে সঠিক অনুসন্ধান করে সেই জটিল পাঠের সঠিক পাঠ অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে।

এছাড়া পুথি সম্পাদক পুথি সম্পাদনার সময় যে কাজটি অবশ্যই করবেন সেগুলি হল–

ক) পুথিটির সম্পূর্ণ বিবরণ দেবেন।

খ) গ্রন্থ উৎপত্তির ধরণ বর্ণনা করবেন।

গ) কাল নির্ণয় করবেন।

ঘ) লেখক পরিচিতি দেবেন।

ঙ) সম্পাদনার অনুসৃত পদ্ধতির কাল জানাবেন।

চ) অন্যান্য প্রসঙ্গ অর্থাৎ সম্পাদিত গ্রন্থটির বিষয়, ভাষা লিপি কৌশল, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য, চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে সম্পাদক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে পারেন।

ধরা যাক কোন মধ্যযুগের পুথিতে লেখা আছে –

স্নান কোরি রঘুনাথ বশিলেন তিরে।
লক্ষণ য়ানিল এক পোন্য মনহরে।।
তাহা দেখি রামচন্দ্র হোইণ কাতর।
শিতা দেবির বিরহেত অঙ্গভার২।।

রাজহ০শ দেখি মনে পতয় গমণ।

কোকিলের স্বরে হয়ে বচন শরণ।।

তাহা অবকাশ পায় দুষ্ট পঞ্চবাণ।

হ্যিদএতে বিন্ধয়া কোরিল খান২।।

এই পুথিটিকে সম্পাদনা করার সময় সম্পাদক কীভাবে সম্পাদনা করবেন তা দেখে দেওয়া যাক।

পুথি পাঠ	সম্পাদিত পাঠ
স্নান কোরি রঘুনাথ বশিলেন তিরে।	স্নান করি[১] রঘুনাথ[২] বসিলেন[৩] তীরে[৪]।
লক্ষণ য়ানিল এক পোন্য মনহরে।।	লক্ষণ আনিল[৫] এক পণ্য[৬] মনহরে।।
তাহা দেখি রামচন্দ্র হোইল[১] কাতর।	তাহা দেখি রামচন্দ্র হইল[৭] কাতর।
শিতা দেবির বিরহেত অঙ্গ ভারভার[২]।।	সীতা[৮] দেবীর[৯] বিরহেতে[১০] অঙ্গ ভারভার।।
রাজহ০[৩]শ দেখি মনে পতয় গমণ।	রাজহংশ[১১] দেখি মনে পতন[১২] গমণ।
কোকিলের স্বরে হয়ে বচন শরণ।।	কোকিলের স্বরে হয়ে বচন স্মরণ[১৩]।।
তাহা অবকাশ পায় দুষ্ট পঞ্চবান।	তাহা অবকাশ পায় দুষ্ট[১৪] পঞ্চবান।
হ্যিদএতে বিন্ধয়া কোরিল খানখান[৪]।।	হৃদয়েতে[১৫] বিন্ধিয়া[১৬] করিল[১৭] খানখান।।
১) পুথিতে ‘হোইল’ এর ‘ল’ ‘ণ’ আকারে লিখিত।	১) তদ্ভব শব্দের ক্রিয়াপদের আধুনিক বানান।
২) ‘ভাব’-‘২’ এই সংকেত ব্যবহৃত।	২) তৎসম শব্দের আধুনিক বানান লিখন।
৩) ‘হংশ’ এর ‘ং’ পুথিতে ‘০’ আকারে লিখিত।	৩) তদ্ভব ,, ,, ,, ,,
৪) ‘খান-‘২’ এই সংকেত ব্যবহৃত।	৪) তৎসম ,, ,, ,, ,,
	৫) তদ্ভব ,, ,, ,, ,,
	৬) তৎসম ,, ,, ,, ,,
	৭) তদ্ভব শব্দের ক্রিয়াপদের আধুনিক বানান
	৮) তৎসম শব্দের আধুনিক বানান লিখন।
	৯) তৎসম শব্দের আধুনিক বানান লিখন।

১০) তৎসম শব্দের আধুনিক বানান শুদ্ধিকরণ

১১) তৎসম ,, ,, ,, শুদ্ধিকরণ

১২) তৎসম ,, ,, ,, শুদ্ধিকরণ

১৩) তৎসম ,, ,, ,, শুদ্ধিকরণ

১৪) তৎসম ,, ,, ,, শুদ্ধিকরণ

১৫) তৎসম ,, ,, ,, শুদ্ধিকরণ

১৬) তৎসম ,, ,, ,, শুদ্ধিকরণ

১৭) তদ্ভব ,, ,, ,, লিখন

৯. অনুশীলনী

১) পুথি কাকে বলে? পুথির উপাদানগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২) পুথির লিপি বিবর্তনটি বিশ্লেষণ করো।

৩) পুথি পাঠোদ্ধার কীভাবে সম্ভব তা আলোচনা করো।

৪) পুথি সংরক্ষণের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করো।

৫) পুথি সম্পাদনার বিষয়গুলি উল্লেখ করো।

৬) পুথি সম্পাদক পুথি সম্পাদনার সময় কোন কোন বিষয়গুলি অধিক গুরুত্ব দেবেন তা উল্লেখ করো।

১০. গ্রন্থপঞ্জি

১) অচিন্ত বিশ্বাস– 'বাংলা পুতির কথা' (২০০৩) রত্নাবলী

২) কল্পনা ভৌমিক – 'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা' (১৯৯২) মাওলা ব্রাদার্স

৩) চিত্রা দেব – 'পুথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা' (১৯৮১), আনন্দ প্রকাশনী

৪) বিশ্বনাথ রায় – 'প্রাচীন পুথি উদ্ধার রবীন্দ্র উদ্যোগ' (১৩৯৯), পুস্তক বিপণি।

৫) মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম – 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা' (২০০৮), গতিধারা।

৬) স্বাতী দাস সরকার– 'বাংলার পুথি বাংলার সংস্কৃতি' (১৯৯৮), সাহিত্যলোক।

ফিচার

ড. সুখেন বিশ্বাস

পত্র-পত্রিকা সাধারণ মানুষদের জন্য ছাপা হয়। তাই এর ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে কোনও জায়গায়, যে কোনও সময় পাঠকপাঠিকারা পত্র-পত্রিকা পড়ে। সে ট্রেনের কামরাতেই হোক বা দুপুর বেলার অবসরে। এই সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ফিচারধর্মী রচনা। ফিচারধর্মী রচনার মূল কথাই হল সরলতা, সহজতা, প্রাঞ্জলতা। ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ, ছন্দ সবকিছুর সঙ্গেই সহজতা, সরলতা ও প্রাঞ্জলতার একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে। তাই একটা বই পড়তে যতটা সময় বা পরিশ্রম দরকার তার চেয়ে অনেক কম সময় বা পরিশ্রম লাগে সংবাদপত্রের ফিচারধর্মী লেখা রচনা করতে। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকার শনিবারের পত্রিকা অংশে একটি ফিচারধর্মী লেখা প্রকাশিত হয়— 'একা মা-র রানি কাহিনি'। বিষয়টি সিঙ্গল মাদারদের নিয়ে লেখা। বোঝাই যাচ্ছে, বিষয়টি ভীষণভাবে ব্যক্তিগত ও বিতর্কিত। একুশ শতকে এসেও সিঙ্গল মা-কে নিয়ে সমাজের প্রচুর প্রশ্ন। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সংবাদপত্র একটি কঠিন, বিতর্কিত বিষয় নিয়ে খুব সহজ, সরলভাবে রচনাটি প্রকাশ করেছে।

বেতার বা টিভিতে কোনও অনুষ্ঠান বা সংবাদ পরিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ থাকে। কিন্তু সংবাদপত্র বা পত্র-পত্রিকার ফিচারধর্মী রচনার জন্য এই বিধিনিষেধ নেই। প্রয়োজনে পাতা বাড়তে পারে। আবার পাঠকদের পড়ার সুবিধার্থে বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়ের ব্যাখ্যা ও জনমত ছাপা হয়। এই ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনের কথোপকথনের ভাষা সংবাদপত্রের ফিচারধর্মী রচনায় ব্যবহৃত হয়। যেমন— বাংলাদেশের কিছু রকমারি রান্নার রেসিপি দিতে গিয়ে সংবাদপত্র শিরোনাম করে– 'বাংলাদেশের হেঁশেল হতে...' (৯ এপ্রিল ২০২২, শনিবার, আনন্দবাজার পত্রিকা)। পেঁয়াজের গুণাগুণ বোঝানো হয় এইভাবে— 'ঝাঁজের চেয়েও গুণ বেশি' (৫ মার্চ ২০২২ শনিবার, আনন্দবাজার পত্রিকা)। শরীরচর্চার প্রসঙ্গে শিরোনাম করা হয়— 'চল্লিশ পেরিয়ে চনমনে থাকুন'। 'হেঁশেল', 'ঝাঁজ', 'চনমনে' এই শব্দগুলো আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। এইগুলিই ফিচারধর্মী রচনার শিরোনামে উঠে এসেছে।

এক.

এখন প্রশ্ন ফিচার কাকে বলে বা ফিচার বলতে আমরা কী বুঝি? ফিচার হল সেই ধরনের রচনা যা সাধারণ পাঠকদের চিত্ত বিনোদনের কথা ভেবে লেখা হয়। এর মধ্যে কোনও কাব্যিকতা, তত্ত্বকথা থাকে না। থাকে না ছন্দ, অলংকার প্রয়োগের ঘনঘটা। তার বদলে থাকে খুব সহজ সরল ভাষায় লেখা সুখপাঠ্য রচনা যা পড়ে পাঠক আনন্দ

উপভোগ করে পারে। ব্যস্ততার অবসরে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে পাঠক ফিচারধর্মী লেখা পড়ে। অনেক সময় স্যারোগেসি, জিন, রাসায়নিক বিক্রিয়া, মনোরোগ, আয়কর, পুষ্টিমূল্য, শেয়ার বাজার, বাজেট, দূতাবাস ইত্যাদি জটিল বিষয় নিয়ে খুব সহজভাবে ফিচারধর্মী রচনা লেখা হয়। কখনও গল্পের ছলে, কখনও বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা তুলে এনে এই ধরনের লেখা প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ফলে পাঠক খুব সহজেই তা পড়ে বুঝতে পারে। অনেক সময় নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাদৃশ্যও খুঁজে পায়। লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবিও দেওয়া হয় যাতে পাঠক বিমূর্ত ধারণাকে মূর্তরূপে দেখতে পায়। উল্লেখ্য, এই ফিচারধর্মী ভাষার সূচনা করেছিলেন সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতা করার সময় অনুভব করেছিলেন—এমন একটি ভাষায় কোনও বিষয়কে উপস্থাপন করতে হবে, তা যেন বইয়ের ভাষা থেকে আলাদা হয়। আবার গল্প বা উপন্যাসের ভাষা থেকেও আলাদা। সম্পূর্ণ নতুন একটা আঙ্গিক, যে ভাষা পড়ে পাঠক সহজেই ঘটনা বা বিষয় পরম্পরা বুঝতে পারবে। এই ভাষা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য ও বোধগম্য হবে।

দুই.

আমরা জানি, উপস্থাপনের গুণাবলীর উপরই সংবাদপত্রের সার্কুলেশন নির্ভর করে। দেখা যাচ্ছে কোনও ঘটনার কথা সব সংবাদপত্রই হেডলাইন করল কিন্তু কোন সংবাদপত্রকে মানুষ গ্রহণ করল কোনওটা একেবারেই বর্জিত হল। নিত্যনতুন শৈলীর উপরই উপস্থাপনের গুণমান নির্ভর করে। মোট কথা সপ্রতিভ ভাষায় বিষয় বা ঘটনাকে উপস্থাপনের মাধ্যমেই রয়েছে এর সার্থকতা। যেমন জঙ্গিপুর লোকসভা নির্বাচনে প্রণব-পুত্র অভিজিৎ মুখার্জি জয়ের পর সপ্রতিভ ভাষায় স্ট্রেটকাট শিরোনাম হয়েছিল একটি পত্রিকায়— ‘অতি কষ্টে জয় পেলেন প্রণব পুত্র’।

এই শিরোনাম পড়ে পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিপক্ষ দল বেশ ধাক্কা দিয়েছে অভিজি মুখার্জিকে। এই ভোটে তারা তাদের ভোটব্যাঙ্কও বাড়িয়েছে। শিরোনামে অভিজিৎ মুখার্জি নাম না লিখে প্রণব-পুত্র অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি-পুত্র লেখাটা অধিক যুক্তিসংগত। বাংলাদেশের মানুষ বিজয়ী প্রার্থী অভিজিৎ মুখার্জিকে যতটা না চেনে তার চেয়ে তিনি শতগুণ বেশি পরিচিত প্রণব-পুত্র নামে।

সংবাদপত্রের ফিচারধর্মী রচনায় কাব্যিকতা বা আবেগ উচ্ছ্বাসের কোনও জায়গা নেই। সরাসরি বা স্ট্রেটকার্ট কোনও বিষয়ের উপস্থাপনার মধ্যেই রয়েছে এর সার্থকতা। ভিন্নার্থক শব্দ বা গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয় না। ৯ ডিসেম্বর ২০১২-এর একটি পত্রিকার পোস্ট এডিটোরিয়ালের পাতার একটা লেখার শিরোনাম— ‘এ ভাবেই শিশুমঙ্গল’? তার নিচে ইন্ট্রোতে লেখা হয়েছে মা বাবা কীভাবে সন্তান মানুষ করবেন, রাষ্ট্রই বলে দেবে? না শুনলে তুলে নিয়ে যাবে শিশুকে? নরওয়ে কাণ্ডে প্রশ্ন তুললেন...। বুঝতে বাকি থাকে না এ ধরনের লেখা কতটা গুরুত্ব পেয়েছে নরওয়ে সরকারের শিশুভাবনায়। তবে মনে রাখতে হবে এই লেখাটাই কিন্তু বোধগম্য।

এখানে পাণ্ডিত্য ফলানোর কোনও জায়গা নেই। সহজ সরল ভঙ্গিতে বিষয়টি উপস্থাপন বা বিশ্লেষণ করাই আসল কথা।

সংবাদপত্রের ফিচারধর্মী রচনায় হালকা চালে গুরুগম্ভীর বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়। পত্র-পত্রিকায় হালকা চালে গুরুগম্ভীর বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়। ভাবমাধুর্য সৃষ্টি করতেই এই ভাষার সার্থকতা, ভাবগাম্ভীর্য সৃষ্টিতে নয়। লৌকিক শব্দ তো বটেই, পাশাপাশি বাগধারা, প্রবাদ প্রবচনের একটা বিশিষ্ট জায়গা আছে পত্রপত্রিকায়। যেমন ধান ভানতে শিবের গীত, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়, উলুবনে মুক্ত ছড়ানো প্রায়শই কাগজের পাতায় ব্যবহার করা হয়। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সাংবাদিকদের যোগ যে অটুট এসব পড়ে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। লৌকিক শব্দ, বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার এখানে লক্ষ করা যায়। এতে যে কোনও গুরুগম্ভীর বিষয় লঘু বা হালকা চালের হয়ে যায়। ১০ এপ্রিল ২০২২ আনন্দবাজার পত্রিকায় রবিবাসরীয়তে একটি লেখা প্রকাশিত হয় নববর্ষকে নিয়ে। শিরোনামে থাকে— ‘বছর আসে, বছর যায়’। কোনও বইয়ে নববর্ষকে নিয়ে লেখা হলে তা হয়ে যেত তত্ত্ব বা তথ্যের ভাণ্ডার। কিন্তু সংবাদপত্র পাঠকদের কথা ভেবে হালকাভাবে বা লঘুচালে নববর্ষ বা হালখাতার অনুষ্ঠানকে তুলে ধরল।

সংবাদপত্রের ফিচারধর্মী রচনায় উপমা, অলংকার প্রয়োগের বিশেষ জায়গা নেই। বাক্যে ক্রিয়াপদের ব্যবহার সেইরকমভাবে নেই। শিরোনামে তো একদম নেই। আসলে ক্রিয়াপদ বাক্যকে দুর্বল করে দেয়। বাক্যকে দাঁড়াতে সাহায্য না করে শুইয়ে দেয়। একসময়ের লোকসভা ভোটে সারা বাংলায় রাজনৈতিক দল মূলত তৃণমূল কংগ্রেস একটি আসন পায় একটি সংবাদপত্রের পাতায় শিরোনাম ছিল ‘এবারে বাংলা লালে লাল’।

বামফ্রন্টের জয়ের খবর এইভাবেই প্রকাশ করেছিল পত্রিকাটি। এখানে কোনও ক্রিয়াপদ নেই। নির্মেদ ঝরঝরে ভাষায় বক্তব্য বুঝবে সেদিন কারও অসুবিধা হয়নি। যা ফলাফল হয়েছে অর্থাৎ যা ঘটেছে তাকে এইভাবেই সরাসরি উপস্থাপন করা হয় সংবাদপত্রে। তার বদলে জোর দেওয়া হয় রচনাটি কতটা পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য হবে তার উপর। আনন্দবাজারে ৯ এপ্রিল ২০২২ শনিবারের পত্রিকায় আমিষ ও নিরামিষ সব ধরনের খাবার রেসিপি ও তাদের ছবি দিয়ে লেখা হয়— ‘ভোজ কয় যাহারে’। সাধারণভাবে খাবার দিলে হয়ত পাঠক এড়িয়ে যেত। কিন্তু প্রত্যেকটি রেসিপির ছবি ও বর্ণনা লেখাটিকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। আবার ১৬ এপ্রিল ২০২২ শনিবারে মানুষের মেধা ও বুদ্ধি নিয়ে আলোচনার শিরোনাম করা হয়— ‘মগজে বুদ্ধির চাষ’। বুদ্ধির বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য এখানে বিভিন্ন পদ্ধতি ও ধাপ খুব সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। বিষয়টি ছট ও বড় সব পাঠকদের কাছে সুখপাঠ্য হয়েছে এর আলোচনা ও লেখনীর গুণে।

অল্প শব্দে বেশি কথা বলার রীতি সংবাদপত্রে সেই প্রথম থেকেই রয়েছে। যেমন— 'পুলিশের গুলিতে ছাত্রের মৃত্যু'। সংবাদপত্রের শিরোনামে এইটুকুই যথেষ্ট। এখানে ছাত্র মানে ছাত্রই। সে রাম, শ্যাম যে-ই হোক না কেন? এখানে সেই ছাত্র যদি কোন মন্ত্রী বা সেলিব্রিটির সন্তান হত তবে গুরুত্ব পেত সেই মন্ত্রী বা সেলিব্রেটির পুত্র এই নামে। পরে আসত সে ছাত্র বা অ-ছাত্র কি না তার প্রসঙ্গ।

প্রথমেই বলেছি সংবাদপত্রের বাক্য অবশ্য পাঠকদের বোধগম্য হতে হবে। ছোট ছোট বাক্যে বিষয়টি উপস্থাপন করার রীতি এখানে লক্ষণীয়। অনেক সময় একটি শব্দ দিয়ে একটি বাক্য তৈরি করার প্রবণতা দেখা যায় সাংবাদিকদের মধ্যে। তা ছাড়া নিত্যনতুন শব্দও সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সেটা অবশ্যই বোধগম্য, সাবলীল। বিশেষ করে সমাসবদ্ধ পদ। যেমন— বইপাড়া, অফিসপাড়া, বিজ্ঞাফোন, রবিবাসরীয়, সুমনামি (সুমন+আমি), শনিবাসর, মগজ মিটার ইত্যাদি।

সংবাদপত্রের ফিচারধর্মী রচনা এমনভাবে লেখা হয় যাতে লেখকের জানাটা পাঠকের কাছে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। পাঠক যেন পড়ার সময় বুঝতে পারে যে লেখক ওই বিষয়ে স্পেশালিস্ট। তাই পাঠক যখন পড়ে— 'তুরুপের তাস আত্মবিশ্বাস'। (২৪ জুলাই ২০২১, আনন্দবাজার পত্রিকা), তখন অচিরেই তার মনে হয় লেখক মনোবিদ বা মন নিয়ে যথেষ্ট চর্চা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে স্বাভাবিক নিয়মে আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকে।

সংবাদপত্রের ফিচারধর্মী রচনার একটি বড় দিক হল পাবলিক রিলেশনশিপ গড়ে তোলা। পাঠক যেন ওই লেখা পড়ে নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পায়, একাত্মতা অনুভব করতে পারে। মানুষের একাকীত্বের কারণ ও সমাধান খুঁজতে গিয়ে একটি লেখা উঠে আসে— 'সায়াহ্নের সঙ্গীযাপন'। বয়সের বিভিন্ন সময়ে মানুষ একাকীত্বে ভোগে। তা থেকে পরিত্রাণের উপায়ও এখানে ব্যক্ত। পাঠক যেন এই রচনাটি পড়ে নিজের সঙ্গে বিষয়টিকে যুক্ত করতে পারে। এই দিকটা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

সংবাদপত্রের ফিচারধর্মী রচনায় আরও একটি বিশেষ দিক হল— স্মার্টনেস। এটি হবে নির্মেদ, স্মার্ট, ঝরঝরে লেখা। ভাষাকে ঝরঝরে, নির্মেদ করার জন্য এই যতিচিহ্নের ব্যবহার বিশেষ নেই সংবাদপত্রে। ঊর্ধ্বকমা, ড্যাশ, হাইফেন, হোসেন-এর ব্যবহার তো প্রায় উঠেই গেছে। পূর্ণচ্ছেদ বা দাড়ির ব্যবহার দিয়েই মূলত সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশন হয়ে থাকে। খবরের কাগজে যেমন আগে গুরুত্ব পায় সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনা, ঠিক তেমনি ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষত বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে সাম্প্রতিককালের বাংলা। রূপগত ধ্বনিগত বাক্য গঠনগত, ছন্দোগত যাই হোক না কেন। যেমন ধরা যাক, জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার পর যে বিষয়গুলো হয়েছিল। আহত-নিহতদের উদ্ধার রাজনৈতিক চাপানউতোর দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপ, তদন্ত কমিশন গঠন, নিহত-আহতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য চাকরির প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি। তার সঙ্গে দোষীদের গ্রেপ্তার পর্বও। প্রথম

পর্বে দুজন গ্রেপ্তার হবার পর একটি পত্রিকা লিখল— 'জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডে ধৃত ২'। এই যে স্টাইল এটা মূলত পাঠকদের ভেবেই করা হয়েছে। কারণ সেই সময় এত বড় রেল দুর্ঘটনা সকলেরই নজর কেড়েছিল। পাঠকরা আগেই জেনে গেছে এই দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত। এখন সেই সব খবর পুরনো। এখন যেটা আকাঙ্ক্ষিত যে খবরের জন্য সকলে মুখে আছে তাহলে এই দুর্ঘটনার কি কোন কিনারা হবে না? দোষীরা কেউ ধরা পড়বে না? সুতরাং ক্রিয়ার রূপটি উহ্য রেখে স্ট্রেটকাট ঝরঝরে বাংলায় লেখা হল বাক্যটি। তা ছাড়া পত্রিকার নামের নিচে বিরতিহীনভাবে সন তারিখ দেওয়া হয় তা পত্রিকার ভাষায় স্মার্টনেসকেই তুলে ধরে থাকে। যেমন— 'কলকাতা ২৮ আশ্বিন ১৪১৯ রবিবার ১৪ অক্টোবর ২০১২ শহর সংস্করণ ৫ টাকা'। এখানে আসল কথা হল সরলতা সহজতা। এই ভাষাতে সহজতা সরলতার কথাই হল মূল কথা। তাই একটা বই পড়তে যতটা সময় বা পরিশ্রম লাগে তার অনেক কম সময় বা পরিশ্রম লাগে সংবাদপত্রের লেখা পড়তে। ধ্বনি শব্দ বাক্য অর্থ ছন্দ সব কিছুর সঙ্গেই যোগ রয়েছে সহজতা সরলতা প্রাঞ্জলতার।

ফিচারধর্মী রচনায় কোনও গৌরচন্দ্রিকা বা কল্পনার অবকাশ এখানে থাকবে না। ঘটে যাওয়া সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে হবে। যেমন বাপ্পী লাহিড়ির অকস্মাৎ প্রয়াণে লেখা হল—'আচমকা বিদায় 'অমরসঙ্গী'-র আবার দীর্ঘ ২ বছরের লকডাউনের পড়ে বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীর অবস্থা বোঝাতে শিরোনাম উঠে এল— 'এবিসিডি ভুলছে দ্বিতীয় শ্রেণি'। এখানে কোনও কল্পনার কথা না বলে সরাসরি ঘটে যাওয়া সঠিক তথ্য খুব সহজভাবে পাঠকদের বোঝার উপযোগী করে পরিবেশন করা হয়েছে।

তিন.

সংবাদপত্রেও শিল্প সৃজন হয়। কারণ ধারাবাহিক উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি এখানে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই গল্প বা উপন্যাসের ভাষার সঙ্গে ফিচারের ভাষা অনেকটাই আলাদা। বিখ্যাত বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সংবাদ উপস্থাপন আলাদা হলেও সব সংবাদপত্রেরই একটি নির্দিষ্ট ভাষা আছে। সেটা সঙ্গে কথ্য বা মৌখিক ভাষা যথেষ্ট মিল আছে। এ ছাড়া সংবাদপত্রের ভাষাকে সাধারণত ফিচারধর্মী ভাষাও বলা হয়।

১. সংবাদপত্রের ফিচারধর্মী ভাষা আসলে শিক্ষিত অশিক্ষিত স্বাক্ষর নিরক্ষর জ্ঞানী মূর্খ সকলের উপযোগী ভাষা। এখানে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কথোপকথনের মৌখিক রূপই তুলে ধরা হয়।

২. সংবাদপত্রের সাংবাদিক বা লেখকেরা সহজ সরল প্রাঞ্জল ফিচারধর্মী ভাষায় সংবাদ বা বিষয়কে উপস্থাপন করে। এখানে শব্দ ব্যবহারের একটা সুচিন্তিত নির্দেশ আছে। জটিল কঠিন শব্দ এখানে একদম ব্যবহার করা হয় না। সমাসবদ্ধ পদ বা কঠিন তৎসম শব্দের ব্যবহার একদমই নিষিদ্ধ। পরিবর্তে লৌকিক আটপৌরে শব্দের ব্যাপক ব্যবহার এখানে লক্ষণীয়।

৩. কাব্যিকতা বা নাটকীয় ভাষার কোনও স্থান নেই এখানে। একটি শব্দের একটিই অর্থ আছে এইরকম শব্দের ব্যবহারই বেশি হয়। পাঠকদের কথা ভেবেই সাধারণত সাংবাদিকরা এই বিষয়টি করে থাকে।

৪. যে ভাষায় ফিচার লেখা হয় সেই ভাষাভাষী মানুষের আবেগ উদ্দীপনা উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতি রীতিনীতি ইত্যাদি স্থান পায়। সাংবাদিক লেখকেরা এক্ষেত্রে ওই সংস্কৃতির সঙ্গে ভাষার নাড়ির যোগ বুঝে সংবাদ পরিবেশন করে বা ফিচার লিখে থাকে।

৫. ফিচারের ভাষা খুবই সপ্রতিভ। এখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার খুবই কম। বিশেষ করে ফিচারের শিরোনামে তো থাকেই না।

৬. ফিচারধর্মী ভাষায় কমা, সেমিকোলন, কোলন ইত্যাদি যতিচিহ্নের ব্যবহার— দাড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের তুলনায় খুবই কম। বাক্যও খুব ছোট ছোট। অনেক সময় একটি শব্দ দিয়েই একটি বাক্য তৈরি করা হয়।

৭. এই ভাষায় অনুপ্রাসের ঝনঝনানি, অলংকারের তীব্রতা একদম নেই। ভাষার শরীর থেকে মেদ ঝরিয়ে এই ভাষাকে করা হয়েছে নির্মেদ, ঝরঝরে। তাই ৭ই পৌষ বা ১৫ই জানুয়ারি বদলে লেখা হয় ৭ পৌষ বা ১৫ জানুয়ারি। 'দুর্ঘটনায় ১০ জন মানুষের মৃত্যু' এই বাক্যের বদলে লেখা হয় 'দুর্ঘটনায় মৃত ১০'।

৮. ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ফিচারধর্মী ভাষায় আবেগ-উচ্ছ্বাসের কোনও স্থান নেই। যা ঘটেছে, ঘটছে বা ঘটতে পারে এমন বিষয়কে সরাসরি উপস্থাপন করার রীতি এখানে লক্ষণীয়।

৯. ফিচারের ভাষায় ভাবগাম্ভীর্যের বদলে ভাবমাধুর্য আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হালকা চালে সকলের বোধগম্য করে বিষয় পরিবেশন করা হয়। তাই লৌকিক শব্দ ছাড়াও বাগধারা, প্রবাদ, প্রবচন ইত্যাদির ব্যবহার এখানে অনেকটাই বেশি। সাহিত্যের ভাষায় ভাবগাম্ভীর্য থাকার ফলে একটি বই পড়তে যতটা সময় বা পরিশ্রম লাগে তার অনেক কম সময়ে এই বইয়ের সবটা ফিচারধর্মী ভাষায় পড়ে শেষ করা যায়।

১০. এর ভাষা মানুষের মুখের ভাষা বলে অত্যন্ত সাবলীল ও বোধগম্য। লেখক সাহিত্যিকদের মতো এখানে সাংবাদিকরাও প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন শব্দ সৃষ্টি করে চলেছে। সেটা অবশ্য হালকা চালে। তা ছাড়া বড় বা গুণিদের নাম ধরে (যেমন 'সনিয়া বললেন', 'রবিশংকর এসে ছিলেন' , 'ধোনি আপনি' ইত্যাদি) ডাকার প্রবণতা দেখা যায়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে কোনও একটি বিষয়কে নতুনরূপে উপস্থাপন করার মতোও বিষয়টি লক্ষণীয়। যেমন— বই সংক্রান্ত আলোচনা হয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এইভাবে হেডলাইন থাকে—'বই-তরণী', 'বই-পার্বণ', 'বইপাড়া' ইত্যাদি।

আধুনিককালে অবশ্য সংবাদপত্রের জেলাভিত্তিক সংস্করণ হওয়ার ফলে জেলার পাতাগুলি আঞ্চলিক হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট জেলায় নির্দিষ্ট সংস্কৃতি অনুযায়ী ফিচারের ভাষা গুরুত্ব পাচ্ছে। আগামী দিনে হয়তো গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ফিচারধর্মী ভাষা গুরুত্ব পাবে।

সাক্ষাৎকার কী?

সাক্ষাৎ থেকে সাক্ষাৎকার শব্দটি এসেছে। সাক্ষাৎ বা দেখা সাধারণত মানুষের সঙ্গে মানুষের হয়ে থাকে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলাপচারিতা, কথোপকথন, কুশল বিনিময় ইত্যাদি হয়ে থাকে। জানা বা অন্যকে জানানোর কৌতুহল থেকে চলে আসে প্রশ্নোত্তর পর্ব। আমরা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করি। কিন্তু সাক্ষাৎকার নিয়ে থাকি বিশেষ মানুষের। অনেক সময় অবশ্য গবেষণার প্রয়োজনে কখনও বা মিডিয়ার প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়ে থাকে সাধারণ মানুষের। উল্লেখ্য সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হবার পর সেই সাধারণ আর সাধারণে সীমাবদ্ধ থাকে না। কিছুক্ষণের জন্য হয়ে যায় অসাধারণ। নীচে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

সাক্ষাৎকারে প্রথমত গুরুত্ব পায় সেলিব্রেটিরা। তারা যে কোনও ক্ষেত্রের হতে পারে। সাহিত্য, সিনেমা, সাংস্কৃতিক জগৎ, খেলাধুলো, রাজনীতি ইত্যাদি। এইসব জায়গায় যারা বিখ্যাত হয়েছে তাদের ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবন ইত্যাদি শুনতে মানুষ আগ্রহ দেখায়। শুধু তাই নয় যারা অসাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কুখ্যাত তাদের কথাও শুনতে চায় সাধারণ মানুষ। বিখ্যাত বা কুখ্যাত অর্থাৎ গতানুগতিক ধারা থেকে যারা অন্য পেশা বা কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের কর্মজীবন, ব্যক্তিজীবন সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করে। অনেক সময় কোনও বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষেরা সাক্ষাৎকার দেওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে। যেমন কোনও দুর্ঘটনা বা অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষকারী সেই ঘটনার বিবরণ দেওয়ার জন্যে সাক্ষাৎকার দেওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি হয়ে ওঠে। কিন্তু চিরকালীনভাবে যাদের সাক্ষাৎকার সকল শ্রেণির মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে তারা নিজ গুণে বা ব্যক্তিত্বে মহান হয়। তাদের প্রতিটি কথা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকারের জন্যে এবং সমীক্ষার ক্ষেত্রে নাম, বয়স, লিঙ্গ, পেশা, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদির দরকার হয়। বিখ্যাত মানুষদের ক্ষেত্রে নামটাই যথেষ্ট। পাঠক বা মানুষের চাহিদা অথবা বৃহৎ অর্থে দেশ বা জাতির উন্নতির কথা ভেবেই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গটি চলে আসে।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে কথাবার্তার মাধ্যমে ব্যক্তি সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে তার মূল্যায়ন করা হয়। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকম তথ্যের মাধ্যমে এক ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব রূপায়িত হতে পারে। সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য নানা রকমের হতে পারে। যেমন— জীবিকার জন্য সাক্ষাৎকার, মনো-চিকিৎসার জন্য সাক্ষাৎকার, পরামর্শদানের জন্য সাক্ষাৎকার। অনেকে সাক্ষাৎকারকে মৌখিক প্রশ্নাবলি মনে করলেও এটা ঠিক নয়। কারণ প্রশ্নাবলী হল অ-প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি আর সাক্ষাৎকার হলো সামনা-সামনি বসে কথোপকথনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি।

সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারী প্রয়োজনীয় তথ্য সামনা-সামনি বসে ব্যক্ত করে। সাধারণত কোনও ব্যক্তি লেখার থেকে বলতে অধিক পছন্দ করেন। একজন দক্ষ সাক্ষাৎকারকের কাছে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যান্য পদ্ধতি থেকে সাক্ষাৎকার অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সাক্ষাৎকারক সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং এমন সব গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন যা সাক্ষাৎকারীর পক্ষে লিখিত ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সাক্ষাৎকার হলো একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া যা তথ্য ও ভাবধারার আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করে। এর জন্য প্রয়োজন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির

নৈকট্য এবং কথাবার্তার সমস্ত রকম পথ উন্মুক্ত রাখা। সাক্ষাৎকার হলো একটি কৌশল যা কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়।

সাক্ষাৎকারের শ্রেণিবিভাগ :

লক্ষ্য, প্রকৃতি ও কার্যধারার প্রেক্ষিত অনুযায়ী সাক্ষাৎকারের শ্রেণিবিভাগ করা হয়—

- ব্যক্তিগত ও দলগত সাক্ষাৎকার—

সাক্ষাৎকার যখন একক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয় তখন তাকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বলে। অধিকাংশ সাক্ষাৎকার এই শ্রেণির। আর সাক্ষাৎকার যখন দলগতভাবে করা হয় তখন তাকে দলগত সাক্ষাৎকার বলে। কোনও ব্যক্তি যখন নিজস্ব চিন্তাধারা, ভাবধারা ব্যক্ত করেন, সে যে বিষয় ভিত্তিক হোক না কেন তাতে ব্যক্তির ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাক্ষাৎকার পরিস্ফুটিত হয়। কিন্তু দলকেন্দ্রিক সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিজস্ব মতামত নয় বরং দলগতভাবে যখন কোনও তথ্য বা যে কোনও দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে দল কেন্দ্রিক সাক্ষাৎকার বলা হয়।

- সংগঠিত, অ-সংগঠিত ও অর্ধ-সংগঠিত সাক্ষাৎকার (Organised, Unorganised and Half organised Interview) :

সংগঠিত সাক্ষাৎকার পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। একই প্রশ্ন এখানে একইভাবে উপস্থাপিত হয়। বিকল্প প্রশ্নের সংখ্যা খুব সীমিত এবং তা পূর্ব-পরিকল্পিত। সংগঠিত সাক্ষাৎকার অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের থেকে অধিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও নির্ভরযোগ্য। এই ধরনের সাক্ষাৎকারের কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। তথ্য সংগ্রহে নানারকম বাধা থাকার জন্য সাক্ষাৎকারক স্বাধীনভাবে প্রয়োজনমতো প্রশ্নের পরিবর্তন করে ব্যক্তির অর্থাৎ সাক্ষাৎকারীর গভীরে প্রবেশ করতে পারে না।

অ-সংগঠিত সাক্ষাৎকার নমনীয় হয়। সাক্ষাৎকারকের প্রশ্নের স্বাধীনতা বেশি থাকে এবং সাক্ষাৎকারীর উত্তরের বাধাও কম থাকে। প্রশ্নগুলি পূর্ব-পরিকল্পিত হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রশ্নের পরিবর্তনে উৎসাহিত করা হয়। অনেক সময় এমনভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয় যে, ব্যক্তি জানতেও পারে না তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। অ-সংগঠিত সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারীর গভীরে প্রবেশ করা যায়, যার ফলে অনেক অ-প্রত্যাশিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই সাক্ষাৎকারের অসুবিধা হল যথেষ্ট পরিকল্পিত না হওয়ায় এবং স্বাধীনতা অধিক থাকায় সাক্ষাৎকারটি সঠিক পথ হারিয়ে ফেলে।

অনেক সময় সাক্ষাৎকার কয়েকটি ভাগে বা অধ্যায়ে বিভক্ত থাকে। অধ্যায়গুলি নির্দিষ্ট থাকলেও অধ্যায়ের প্রশ্নগুলি পরিবর্তনযোগ্য। এরূপ সাক্ষাৎকারকে অর্ধ-সংগঠিত সাক্ষাৎকার বলে।

- অ-নির্দেশিত এবং কেন্দ্রীভূত সাক্ষাৎকার (Non-directive and Focussed Interview) :

অ-নির্দেশিত সাক্ষাৎকার (মনোবিশ্লেষণ যার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট) অভ্যন্তরীণ প্রেষণা, অন্তর্নিহিত প্রতিন্যাস, ব্যক্তিগত আশা, ভয়, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীভূত সাক্ষাৎকার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যেমন, কোনও পুস্তক পঠন ব্যক্তির উপর কী প্রভাব ফেলেছে জানতে হলে সাক্ষাৎকারক পুস্তকটি সম্পূর্ণভাবে পড়ার পর সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন নির্দিষ্ট করবেন এবং এই প্রশ্নগুলিকে ভিত্তি করে ব্যক্তির উপর পুস্তকের প্রভাবের মূল্যায়ন করবেন। এখানে ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা পেলেও সাক্ষাৎকারক নির্দিষ্ট দিকে সাক্ষাৎকারকে পরিচালিত করবেন।

- আদর্শায়িত ও অ-আদর্শায়িত সাক্ষাৎকার (Standardised and Non-standardised Interview) :

আদর্শায়িত এবং সংগঠিত সাক্ষাৎকারের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মধ্যেই উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নাবলির পদ্ধতির মিল আছে। নির্দিষ্ট পরিবেশে, নির্দিষ্ট প্রশ্নের মাধ্যমে এই সাক্ষাৎকার পরিচালিত হবে। সাক্ষাৎকারীকে এখানে খুব অল্প স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারীর উত্তরও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বিবেচিত হয়। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত কৌশল হলেও এই পদ্ধতি ব্যক্তির গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। অ-সংগঠিত সাক্ষাৎকারের সঙ্গে অ-আদর্শায়িত সাক্ষাৎকারের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এখানে প্রশ্নগুলি অনেক সময় পূর্ব-পরিকল্পিত হলেও সাক্ষাৎকারীর গভীরে প্রবেশ করার জন্য সাক্ষাৎকারককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ব্যক্তির উত্তরেও কোনও বাধানিষেধ থাকে না। এই সাক্ষাৎকার আদর্শায়িত সাক্ষাৎকার অপেক্ষা কম নির্ভরযোগ্য হলেও ব্যক্তি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। ব্যক্তির গভীরে প্রবেশ করার জন্য এই সাক্ষাৎকার বিশেষ উপযোগী।

উপরিউক্ত শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও আরও নানাভাবে সাক্ষাৎকারকে বিভক্ত করা যেতে পারে—

- চিকিৎসাকেন্দ্রিক সাক্ষাৎকার
- দুর্বলতা নির্ণায়ক সাক্ষাৎকার
- বৃত্তিকেন্দ্রিক সাক্ষাৎকার
- মনোচিকিৎসাকেন্দ্রিক সাক্ষাৎকার
- পরামর্শকেন্দ্রিক সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার কৌশলের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারক ও সাক্ষাৎকারীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর খুব উন্মুক্ত পরিবেশে হয় এবং সাক্ষাৎকারক সাক্ষাৎকারী সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। সাক্ষাৎকারক সাক্ষাৎকারীর নিকটে থাকার ফলে উভয় ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের অবকাশ পাওয়া যায়। তা ছাড়া অভিজ্ঞ সাক্ষাৎকারক কথোপকথনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারীর আবেগ লক্ষ করতে পারেন। তবে এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো সাক্ষাৎকারকের ব্যক্তিগত প্রভাব। সাক্ষাৎকারক তার চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাসের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন যা সাক্ষাৎকারীর প্রতিক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলে। পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, সাক্ষাৎকারের কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং

ক্রস-চেকিং-এর সাহায্যে তথ্যগুলিকে যাচাই করে নেওয়া হয় তাহলে এই পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। কোনও বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দলের সাথে অন্য একজনের কথোপকথন হয়ে থাকে। সাক্ষাৎকার একটি কার্যকর শিখন-শিক্ষণ কৌশল। পূর্বে উল্লিখিত শ্রেণিবিভাগগুলি ব্যতীত উদ্দেশ্যের ভিন্নতা অনুযায়ী সাক্ষাৎকারকে আরও কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—

- নির্বাচন মূলক সাক্ষাৎকার—

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় কর্মী নিয়োগের জন্য যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় তাকে, নির্বাচনমূলক সাক্ষাৎকার বলে। এই ধরনের সাক্ষাৎকারে কোনও নির্দিষ্ট পেশায় বা কর্মে নিযুক্ত করার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হয়।

- নির্ণায়ক ও লক্ষ্য নির্ধারণ মূলক সাক্ষাৎকার—

কখনও কখনও ব্যক্তি তার মানসিক বা শারীরিক অসুস্থতার জন্য শিক্ষামূলক বা বৃত্তিমূলক কাজে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারে না। এই অবস্থায় ব্যক্তির সমস্যা নির্ণয় করার জন্য তিন ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

- তথ্য জ্ঞাপক সাক্ষাৎকার—

এ ধরনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের পারগতা ও কৃতিত্ব সম্পন্ন কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও বিশ্লেষণ করা হয়।

- প্রাথমিক ও প্রস্তুতিমূলক সাক্ষাৎকার—

ব্যক্তিকে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল আচরণ দ্বারা ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক ও জটিল সাক্ষাৎকারের জন্য এ ধরনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রস্তুত থাকতে সহায়তা করা হয়।

- অনুসন্ধানমূলক সাক্ষাৎকার—

অনেক সময় কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ধরনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যক্তিকে বিভিন্ন রকম অবস্থার মোকাবিলা করা এবং নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে তার তথ্য ও ঘটনার প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকেন।

- শৃঙ্খলামূলক সাক্ষাৎকার—

এ ধরনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কোনও ঘটনা সংস্থা বা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিবার্হী তার অধীনস্থ কর্মীদের অনিয়ম-তান্ত্রিকতা ও বিশৃংখলার কারণ অনুসন্ধান করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন।

- পরামর্শমূলক সাক্ষাৎকার—

অনেক সময় ব্যক্তির মূল সমস্যা চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল—

সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সফলভাবে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

কৌশলগুলি নিম্নে তুলে ধরা হল—

- পর্যবেক্ষণ কৌশল
- শ্রবণ কৌশল
- কথা বলার পূর্বে শ্রবণ কৌশল
- প্রশ্ন করার কৌশল
- কথা বলার কৌশল
- ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর কৌশল
- ব্যাখ্যাদান কৌশল

সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি—

একটি উপযুক্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান করতে গেলে উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। এজন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে এ ব্যাপারে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। সাক্ষাৎকার গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে—

- সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য উপলব্ধির সুযোগ দিতে হবে।
- সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের জন্য নির্জন স্থান বেছে নিতে হবে।
- সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করার পর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে।

- সাক্ষাৎকারে প্রয়োগ করার জন্য আগেই প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রাখতে হবে এবং ধৈর্যশীল হতে হবে।

সাক্ষাৎকারের কৌশলগত বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের উপায়—

কী কী কৌশল অবলম্বন করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে আগেই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পূর্বপরিকল্পনায় কী বিষয়ে, কোথায় ও কখন সাক্ষাৎকার গ্রহণ তাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সাক্ষাৎকারে কৌশলগত বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য যে উপায়গুলি অনুসরণ করা যায়—

- কী প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকার হবে তা আগে ঠিক করে নেওয়া।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা।
- সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিত্ব, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণ বা প্রদানের জন্য একটি পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- সাক্ষাৎকারে যে প্রশ্ন করা হতে পারে তার একটি ছক তৈরি।
- সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তি বিরক্ত হবে এমন প্রশ্ন না করা।
- সাক্ষাৎকারে ব্যবহারযোগ্য প্রশ্নমালা নির্ভুল, সুস্পষ্ট, বোধগম্য ও সরাসরি হওয়া উচিত।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তির কোন দিকটি জানার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে তা ঠিক করে নেওয়া।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ হলে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে ধন্যবাদ দেওয়া।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের যেমন কোনও শিল্পী, সাহিত্যিক, ভাষাতাত্ত্বিক প্রমুখের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় তাদের কথাবার্তা ও প্রদেয় তথ্য থেকে তাদের কৃতিত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি আগামীদিনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ থেকেই ধারণা লাভ করা সম্ভব।